ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্নদামঙ্গল কাব্য

বাংলা সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনভূমিকে যুগ বিভাজনের মাধ্যমে আমাদের সামনে বোধগম্য করে তোলার একটা পথ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তা না হলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতো। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ — এই তিনটি যুগের সীমায়িত সময়ের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যাত্রা করতে আমাদের সুবিধা হয়। প্রাচীন যুগ প্রায় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী, মধ্যযুগ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, আর আধুনিক যুগ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

মধ্যযুগের বিশাল প্রেক্ষাপট জুড়ে বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষভাবে দেবতা কেন্দ্রিক ছিল তা আমরা জানি। ভয়, ভক্তি তাছাড়া দেব-দেবীদের স্বপ্নাবেশে আবিষ্ট হয়েই কবিরা মঙ্গলকাব্যগুলি রচনা করেছেন। তবে সময়ের গতি সমাজকে একভাবে চলতে দেয় না, সময়ের তথা যুগের চাহিদাতেই সমাজ বদলে যায় — যার প্রতিচ্ছবি সাহিত্যেও লক্ষণীয়। কারণ সাহিত্য সমাজের দর্পণ এবং চিরকালই সাহিত্য দেশ-কাল-পাত্র নির্ভর। সম্পূর্ণ মধ্যযুগের সমাজ জীবন জুড়ে চলেছে একের পর এক ঘটনা। ''*খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে বাংলাদেশ বহিরাগত মুসলিম শক্তির কাছে পরাভূত হয়। এই বহিরাগত তুর্কি মুসলমানদের ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার প্রবণতা বাংলাদেশের উপর দিয়ে এক প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দেয়। এরা বাঙালীর বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র বৌদ্ধ বিহারগুলি এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত অধ্যুষিত গ্রামগুলি একেবারে ধ্বংস করে ফেলে। সেন রাজাদের আমল থেকে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে প্রবাহ বিস্তৃত হচ্ছিল তার স্রোত অকস্মাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল। মুসলমানদের এই অমানুষিক বর্বরতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষ বৈদিক রুদ্র দেবতার শান্ত*

সমাহিত মূর্তির মধ্যে আর নিজেদের জীবনের আশ্বাস খুঁজে পেলেন না তাঁরা তখন কল্পনা করলেন এক অমোঘ শক্তি সম্পন্না দেবীকে যাঁর অলৌকিক বর প্রভাবে সাধারণ মানুষও অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।"[১]

এই সমস্ত নানা কারণ থেকেই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের সৃষ্টি। "*এই দেবতারা নীচ, ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ভয়ানক স্বার্থপর, ভক্ত যেমন নিত্য প্রয়োজনে তাঁদের কাজে লাগায় তাঁরাও তেমনি ভক্তের কাছে তাঁদের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেন। একটু ত্রুটি ঘটলেই সর্বনাশ। ভক্তকে ধনে প্রাণে সংহার করতেও তাঁদের বাধে না। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলোতে এই সব ভীষণ প্রকৃতির দেব-দেবীদের সাক্ষাৎ মেলে। পরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে এই সব ক্রূরমনা দেবতা শান্ত করুণাময় হয়ে পড়লেন।"*[২] আসলে সময়ের আবহমান স্রোতের ধারায় সমাজ যখন বদলে যেতে প্রস্তুত তখন দেবতারাও নিজেদেরকে বদলে নেন। এমনই পরিবর্তিত সময়েরই দলিল অষ্টাদশ শতাব্দীর রচিত 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'।

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা ভারতচন্দ্র রায়ের রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছি। দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদাকে কেন্দ্র করেই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি রচিত হয়েছে। "*মঙ্গল দেবতাদের উৎপত্তি যেমন আত্মরক্ষার ও আত্মশক্তি বিকাশের প্রয়োজনে, তেমনি ভাবেই উৎপত্তি মঙ্গলকাব্য রচনারও। কারণটা সেই দেব-দেবীর অনুগ্রহ লাভ ও বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া। এই সমস্ত দেবতারা পৌরাণিক নন, লৌকিক। অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে সাধারণ মানুষকে হিন্দুধর্মাসক্ত করার জন্যই পৌরাণিক দেবতাদের আবির্ভাব। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অন্তিম দশায় খ্রীষ্টিয় নবম-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ কর্তৃক কিছু কিছু লৌকিক দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটে। এইসব লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। তাই সে সমস্ত দেবদেবীর সম্পর্কিত মঙ্গলকাব্যগুলির একটা বাঁধা ছক বা রীতি ছিল। কোন কবিই এই রীতির বাইরে গিয়ে কোন কিছু রচনা করতে সমর্থ ছিলেন না। তাই সাহিত্য রচনা করতে হলে সব শক্তিধর কবিকেই এ গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যধারায় সামিল হতে হতো। নিজস্ব প্রতিভার আলোয় সেই প্রথাসিদ্ধ বিষয়ের মধ্যেও মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন অনেকেই। দেবতার বন্দনা গান গাইতে গিয়েও তারা বারবার*

নেমে এসেছেন বাস্তব মানুষের এই ধূলামাটির পৃথিবীতে — ঐতিহাসিক ঘটনার সংঘাতময়তায়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, সামাজিক রীতি-নীতি, কুসংস্কারগুলো পর্যন্ত ওই (অভিশপ্ত দেব-দেবী) নায়ক-নায়িকাদের উপর ন্যস্তের সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন কবিরা।"[৩] এভাবেই কবি ভারতচন্দ্র দেবী অন্নদার বন্দনা গান গেয়ে সাধারণ মানুষের সাধারণ চাহিদা-কামনা-বাসনার কথা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তুলে ধরেছেন।

যুগসন্ধিক্ষণের সময়ে অন্নদামঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি। কারণ একদিকে মধ্যযুগ তার বিশিষ্ট ক্ষয়-ক্ষমতা, সংস্কার ও শক্তি নিয়ে দূর-দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে। আর অন্যদিকে আধুনিক মানবিক বোধের আভাস অল্প অল্প করে দেখা দিচ্ছে। মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনার অবক্ষয়ের ছবি ফুটে উঠেছে ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। "*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগে সর্বশেষ চিহ্নিত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর আবির্ভাব। কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির তার নিজের আবির্ভাবের সময়কার প্রতিকূল সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতো মানুষের জীবনের নানা বিপত্তির বর্ণনা দিয়েছেন। সে বর্ণনা থেকে জানা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায়ের অবস্থা বিরাজ করেছে। ফলে সাধারণ মানুষের তো বটেই, দুর্বল রাজা মহারাজাদের জীবনেও বারবার নেমে এসেছে বিপত্তি।"*[৪]

এই বিপত্তি থেকে মানুষ পরিত্রাণ লাভের আশায়ই দেবী অন্নদার কৃপালাভ করতে চেয়েছে। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দেবী 'অন্নদা' নিজের পূজা প্রচারের জন্য উৎসাহী, তার পেছনে কাজ করেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়ের যন্ত্রণা। মধ্যযুগের ভূমিতে দাঁড়িয়েই আধুনিক যুগের সূর্যআভা অল্প অল্প করে প্রকাশের জন্য অপেক্ষমান। বলিষ্ঠ ভূমিকায় এবারে মানুষের প্রকাশ হচ্ছে, দেব-দেবীরাও আছেন কিন্তু ততটা যেন মুখ্য ভূমিকায় নয়। "*অন্নদামঙ্গল কাব্যে মঙ্গলকাব্যের কাঠামো অনুসৃত হলেও এর চরিত্রগুলি বাংলাদেশের বাস্তব পরিবেশ থেকে নেওয়া হয়েছে। স্বর্গের দেবদেবীরাও যেন তাঁদের অলৌকিক মহিমা ত্যাগ করে পথে ঘাটে সাধারণ মানুষের দীনতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর দেবতারা তাই শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভয়ের পাত্র না হয়ে বাস্তব সঙ্গী হয়েছেন..."*[৫]

বাস্তব সঙ্গী হয়েছেন বলেই এই কাব্যে দেবতাদেরও আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গি সাধারণ মানুষের মতোই। ''*মধ্যযুগীয় যে ভক্তিভাবনা দৈববিশ্বাসকে অবলম্বন করে, একদিকে চৈতন্য সংস্কৃতি ও অপরদিকে মঙ্গল দেবদেবীর উপাসনাকে আশ্রয় করে প্রবহমান হয়ে চলেছিলো ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত, অষ্টাদশ শতকে এসে যেন সেই ভক্তি ও দৈববিশ্বাসে লাগলো সংশয়ের আঘাত।*''[৬] মানুষই মানুষের জন্য এবং ভালবাসার জয়গান মানুষকেই সমাজের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের পটভূমিতেই লক্ষ্য করা যায় যে সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক, পারিবারিক দাম্পত্যজীবনে অশান্তি, হিংস্রতা বিরাজ করছে। বাস্তবে মানুষের মঙ্গল সাধিত হলেই সংসারে শান্তি বিরাজ করতে পারে সেই শান্তির বার্তা বহন করে চলেছে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের থেকে অন্নদামঙ্গলের কাহিনি একটু ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ধরনের। এক নূতন বার্তার সূচনা যেন করেছে এই মঙ্গলকাব্য।

আঠারো শতক — যুগসন্ধিক্ষণের সময়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝতে পারব যুগসন্ধিক্ষণের সময়গুলো বেশ কঠিন, মানুষ নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। এই বিপর্যস্ত মানুষের জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। ''*মঙ্গলকাব্যের পুরাণসম্মত ভক্তিকাহিনীর আধারে এইভাবে কবি উপস্থিত করেছেন নূতন জীবন-জিজ্ঞাসা ও ধর্মবোধ যার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ছিলো এক আভ্যন্তরীণ দ্বিধা। ভারতচন্দ্রের সেই জীবন-জিজ্ঞাসা হল পূর্ণতই মানবকেন্দ্রিক। তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনায় মর্মকেন্দ্রেও ছিলো মানুষ; আর সেই মানুষ কেবল দৈবনিগৃহীত অথবা কেবল দৈবকৃপাপুষ্ট নয়; নানা বিরোধী দোষে-গুণে পূর্ণ সেই মানবিক সত্তায় ভারতচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন বাস্তব জগৎ সংসারের অকরুণ সংগ্রামের চিহ্নগুলি। তাই দেবচরিত্রও কবির কাছে মানব নিয়তির অধীন হয়ে দেখা দিয়েছে। শিব যিনি দেবাদিদেব মহাদেব, যিনি সমগ্র বিশ্বের পরমেশ্বর, যিনি স্বয়ং চিদানন্দস্বরূপ, তাঁকেও দেখতে পাই নিতান্ত সাধারণ নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের মতোই অন্নপ্রার্থী।*''[৭]

সময়কে বা সময়ের নিদারুণ করাঘাতকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই মানুষের, কবিরও ছিল না কোন উপায়। সময়ের জমিতে যেরকম চাষ হয়েছে তার ফসলই আমাদের সামনে উঠে এসেছে। আমরা সময়েরই সন্তান, তাই সময়কে স্বীকার করেই জীবনের পথে চলতে হয়।

''হাস্য-পরিহাসের অন্তরালে অবসিত মধ্যযুগের ক্লান্ত ভক্তির দীর্ঘশ্বাস; এবং দেবতার অলৌকিক শক্তির প্রভূত নিদর্শন সত্ত্বেও, শিথিল ভক্তির পটভূমিকায় জাগতিক মানুষেরই উদ্যম ও বিপর্যয়ের কাহিনী।''[৮]

দরিদ্র-হাহাকার ক্লিষ্ট মানুষের জীবনে অন্নই প্রধান ভূমিকা পালন করে। সমাজের মধ্যে ক্ষত কোথায় কোথায় সৃষ্টি হয়েছে তা মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে কবি ভারতচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন। এই যুদ্ধ, হত্যা, অমানবিক আচরণ তাতে বিপর্যস্ত সবচেয়ে বেশি সাধারণ মানুষরা হয়েছে। অথচ যুদ্ধের পূর্বেও সাধারণ মানুষদেরই কষ্টের সীমা ছিল না কিন্তু, পরবর্তিতে যুদ্ধের তাণ্ডবে তাদের কষ্টের সীমা আরও দ্বিগুণ বেগে বৃদ্ধি পায়। শাসকগোষ্ঠীরা এভাবে সমাজের অভ্যন্তরে এমন বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি করেন; যে ক্ষত দিন দিন গভীর হতে থাকে। ''*ভারতচন্দ্রের কবিমানস গড়ে উঠেছিলো অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার যে পরিবেশ ও জীবনচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে তা ছিলো এক বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের উপাদানে বিদ্যুৎগর্ভ। দিল্লীর মোগল শক্তির অস্তায়মান অবস্থায় বাংলার নবাবি-শক্তির অভ্যুত্থান মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে। কিন্তু সেই নবাবি আমলও মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পরেই অপদার্থ নবাবদের বিলাসপরায়ণতা ও শাসনশৃঙ্খলা বিধানে নিদারুণ অবহেলার ফলে রাজ্যলিপ্সুদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-ষড়যন্ত্রে নিদারুণ বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলো। ... অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত পঞ্চম দশক জুড়ে বাংলাদেশে যে মারাঠা আক্রমণের তাণ্ডব চলেছিলো, সেই দুর্যোগের ভয়াবহতা ইতিহাসস্বীকৃত সত্য। ... সেই দুর্যোগে বর্গীর আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো মনোবল, এমন কি নৈতিক বলও ছিল না বাংলাদেশে। আবার এরই মধ্যে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠলো মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু-ভূস্বামী ও বণিক সম্প্রদায়ের বহুদিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ। সর্বত্রই একটা ষড়যন্ত্রময় আবহাওয়া। উপরন্তু সেই ষড়যন্ত্রে ক্রমশ এসে যোগ দিল ইংরেজ বণিকেরা। নব-অভ্যুদিত কলকাতার নূতন জীবনধারার সঙ্গে বিরোধ বাধলো মুর্শিদাবাদ-কেন্দ্রিক বাংলার নবাবি জীবনধারার। দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনে শত নিত্যকর্মের ভিতর দিয়ে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিলো, তাতে ভাঙন ধরলো এবং কারও সামনে কোনো সুউচ্চ জীবনাদর্শ না থাকায়, হীনপ্রবৃত্তিগুলির স্রোত অবারিত হল। অবাধ কামকেলি, লম্পট ও মদ্যপের নারকীয়*

উল্লাস সমগ্র অভিজাত সমাজকে তখন ক্লেদাক্ত করে তুলেছিলো। নৃত্য-গীতে, হাসি, ঠাট্টা, ভাঁড়ামিতে, নারীদেহের ইঙ্গিতবাহী বর্ণনায় এবং আসঙ্গ-লিপ্সা চরিতার্থ করবার বিচিত্র উপায় আবিষ্কারে সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিরা শুধু দেহকামনার আগুন জ্বালিয়ে রাখতেই তৎপর ছিলেন, কোন মহৎ মানবিক আদর্শের কথা বলতে গেলেই ভাগ্যে ছিলো উপহাস, নতুবা আরও কঠিন কোনো বিড়ম্বনা। অপরদিকে মারাঠা আক্রমণের ফলে দেশের কৃষি অর্থনীতি এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলো যে দরিদ্র মানুষের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেরও ব্যবস্থা করতে প্রাণপাত করতে হ'ত। ফলে আর্থিক শ্রেণীগত বিভেদ আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিলো তখন। হতভাগ্য দরিদ্র সাধারণের লাঞ্ছনার শেষ ছিলো না। মুর্শিদাবাদের শাসনযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ও নিপীড়ন অপেক্ষা ভূস্বামী সামন্ত-প্রভুদের শোষণ ও নির্যাতন যে কম ছিলো, এমন নয়। তার উপর ছিলো দস্যুতস্করের উৎপাত। পর্তুগীজ জলদস্যুর আক্রমণ, মর্মান্তিক দাস-ব্যবসায় অতি নগণ্য মূল্যে বালিকাবিক্রয় ইত্যাদি। দারিদ্র্যের জ্বালা যে ভয়ানক হয়েছিলো, এরূপ অসংখ্য ঘটনাই তার প্রমাণ। অন্নের অভাব তাই ভারতচন্দ্রের কেবল শুদ্ধকল্পনা নয়, তা সেকালের একটি বাস্তব সত্যও বটে।"[৯] সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ, তাই সমাজের কথা খুব সহজেই সাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়ে।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি দিলেই সেকালের বিশৃঙ্খল সমাজ পরিস্থিতির ছবি আমরা দেখতে পাই। ''*বর্গীর হাঙ্গামা বাঙালী জীবনে এক মহানিশার দুঃস্বপ্ন। এ হাঙ্গামার প্রতিধ্বনি এখনও পর্যন্ত বাঙালী মায়েদের ছেলেমেয়েদের-ঘুম পাড়ানো গানে সঞ্জীবিত হয়ে আছে। এটা ঘটেছিল আলিবর্দি খান যখন বাঙলার নবাব ছিলেন। বেরারের মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সমেত ভাস্কর পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তিকে বাঙলায় পাঠিয়েছিলেন চৌথ আদায় করবার জন্য। বাঙলার নবাব আলিবর্দি খান তখন ওড়িশা অভিযানে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে মারাঠাদের প্রতিরোধ করবেন। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না, কেননা মারাঠারা ইত্যবসরেই ওড়িশার ভিতর দিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেছিল। বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে বাঙালীরা অসীম বীরত্বের সঙ্গে মারাঠাদের প্রতিহত করেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া মারাঠাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তরবারীর জোরে*

গ্রামসকল লুণ্ঠন করা। চতুর্দিকেই এতে এক সন্ত্রাস পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।"[১০]

মানুষের জীবনের আর্তনাদ, হাহাকার, বিপন্নতা, দুঃখ-ক্লিষ্টতার ছবি খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি ভারতচন্দ্র —

"*বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।*
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।।
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।
কাটির বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।।
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল।।"[১১]

এমন পরিস্থিতিতে চতুর্দিকে অনাহার আর মানুষের আর্তনাদ জীবনকে একেবারে বিষিয়ে তুলেছিল। মানুষ কাতর কণ্ঠে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য চিৎকার করছে। "*সমস্ত যুগ ও পরিবেশের আসল ধর্মই ছিলো যেন ছলনা, কপটতা ও স্বার্থক্লীন্ন মিথ্যাচার। তীব্র ঘৃণায় অথচ অত্যন্ত কৌশলে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে তাই উগ্র আঘাত না করে উপায় ছিলো না ভারতচন্দ্রের। অতিশয় বাস্তবসচেতন ও বাস্তবজীবনবাদী কবির পক্ষে এই ছিলো অনিবার্য নিয়তি। কবির সেই অনিবার্য নিয়তিরই ফল হ'ল প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী ব্যাসদেবের উপহাসকরুণ পরিণাম চিত্রণ। বাংলার ইতিহাসের সেই দুর্দিনে, ধর্মীয় কলহের অসহ পরিবেশে ভারতচন্দ্র তাই অতি তীক্ষ্ণ ভাষায় শুনিয়েছেন ধর্মসমন্বয়ের কথা। হয়তো একান্ত মানবিক প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ধর্মসমন্বয়ের কথা তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ধর্মবিশ্বাসের ও ভক্তিভাবনার কোনো পরিচয় ছিলো না, তবু দীপ্তবুদ্ধির আলোয় জীবনে চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির জন্য প্রকৃত মানবিক জীবনসাধনার যে পথনির্দেশ তিনি করতে চেয়েছিলেন, তার মৌল প্রেরণা এসেছিলো সেই যুগজীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার থেকেই।*"[১২]

যুগজীবনকে কেন্দ্র করে মানবিক জীবনসাধনার একটা প্রয়াস চালিয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে একটা যুগ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় নি, আবার সেই সময়েই আরেকটা যুগকে স্বাগত জানানোর জন্য মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই কাব্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক বিপর্যয়ে নর-নারীর অন্তর্জীবনের স্থিতি কিরূপ ছিল তার চিত্র সহজেই অনুমেয়। অনুমান করা যায়, কবি যে সমস্ত চরিত্র চিত্রণ করেছেন — তা তাঁর চারপাশেরই চরিত্র। সমাজে সেই সময়ে যা ঘটে গেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কবি দিয়েছেন। মানুষ থেকেই সমাজের সৃষ্টি। তাই সাহিত্যের মানুষরা কখনই সমাজ বহির্ভূত নন। সামাজিক প্রতিফলনের রূপই উঠে আসে সাহিত্যে। ''*গ্রামীণ হৃদয়াবেগ মথিত গভীর জীবনানুরাগের কাব্যধারাকে তিনি নিয়ে এসেছেন বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক জীবনরঙ্গের মাঝখানে; সে রঙ্গপটে জীবনের রূপ কেবল অভাবে ও দারিদ্র্যে ক্ষতবিক্ষত নয়, ভোগস্বপ্নেরও দুরন্ত বিক্রমে এই জীবন উজ্জীবিত।*''[১৩] উজ্জীবিত জীবনের নবচিত্র কবি অঙ্কন করেছেন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে।

মধ্যযুগে রচিত অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে লক্ষ করা যায় দৈবশক্তির মায়াকে কোন বিচার-বিবেচনা না করেই মেনে নেওয়া হয়েছে; কিন্তু 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এমন চিত্র দেখা যায় না। দেবতা আর কেন্দ্রবিন্দুতে নেই, কেন্দ্রবিন্দুতে অল্প অল্প করে মানুষের বিকাশ হচ্ছে। দেবতাও আছেন তবে এতটা প্রকাশ্যে নয়। ''*... মধ্যযুগীয় দৈব নির্ভরতার পরিবর্তে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত ভাবনার কেন্দ্রে দেবতাকে সরিয়ে নিজেকে স্থাপন করেছে মানুষ। তাই একালের সাহিত্য আর দেবতার কাহিনী নয়; চৈতন্যজীবনীর মতো দেবত্বমণ্ডিত মানবত্বের কাহিনীমাত্রও নয়; আধুনিক বিশ্বের সাহিত্য এখন পূর্ণতই প্রাকৃতিক ও সামাজিক মানুষের বাস্তব সুখ, দুঃখ ও স্বপ্নের কাহিনী। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বাংলা সাহিত্যের সেই মানবতান্ত্রিকতার প্রথম জয়িষ্ণু আত্মপ্রকাশ।*''[১৪] অন্নদামঙ্গল কাব্যে মানবতার জয়গানই ধ্বনিত হয়েছে; যে গানে আমরা আজও (একবিংশ শতাব্দীতেও) মন্ত্রমুগ্ধ।

ভারতচন্দ্র যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই সময়ে চারদিকে শুধু ভাঙন, অরাজকতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক বিপর্যয় ভারতচন্দ্রকেও স্পর্শ করেছিল, যার প্রভাব 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এসে পড়েছে। ''*ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই অরাজকতা ও দারিদ্র্যের লাঞ্ছনার*

সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। জীবনের কাছ থেকে যে-দুঃখ তিনি পেয়েছেন তাকে নিজের প্রাপ্য বলে ভাবা কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রসন্ন হাস্যে ভাগ্যের উপহাসকে জয় করতে তিনি পারেন নি। তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে তাই বিশ্বকে বিদ্ধ করায় তাঁর প্রচুর উৎসাহ।"[১৫] কবি তাঁর চারপাশে এমন দৃশ্যগুলিই লক্ষ্য করেছেন, যে দৃশ্যগুলি কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

জীবনে বাঁচার তাগিদই সব থেকে উর্দ্ধে, এই চরমসত্যকে কবি কাব্যের অঙ্গনে তুলে ধরেছেন স্বমহিমায়। আলোচ্য মঙ্গলকাব্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে স্বতন্ত্র। "*চতুর মানুষের রঙ্গ-রসিকতার দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র সমস্ত দেবদেবীকে দেখেছেন — দেবদেবীর প্রতি তাঁর ভয়ভক্তি বিশেষ নেই; কলা-কুশল কবির মতো তিনি কাব্যবিন্যাস করেছেন সিদ্ধ হস্তে;*"[১৬] প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই লক্ষ করা যায় ভয় দেখিয়ে দেব-দেবীরা নিজের প্রতি ভক্তি উপার্জন করেছেন। মানুষ নিজের জীবনের মঙ্গল কামনা করে দেব দেবীদের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করছে; কিন্তু ভয় দেখিয়ে মানুষকে আর কাবু করা গেল না।

সময়ের চলমান গতিতে ভয়ের রূপও বদলে গেল। মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে শুধু দেবদেবীদের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করলেই মঙ্গল সাধিত হবে না। নিজেকেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে জীবনে কী করে সুখ-সমৃদ্ধি আসে। যুগও বদলে যাচ্ছে তার আভাসও আমরা পেয়ে যাচ্ছি। "*অন্নদামঙ্গল (বা অন্নপূর্ণামঙ্গল) ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর নয় বৎসর পূর্বে রচিত হয় (খ্রীঃ ১৭৫২-৫৩)। এ কাব্যে আটটি পালা, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় তা প্রথম গীত হয়েছিল। অন্নদামঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত, সে বিভাগ এরূপে করা চলে ঃ প্রথম খণ্ড — শিবায়ন - অন্নদামঙ্গল; দ্বিতীয় খণ্ড — বিদ্যাসুন্দর - কালিকামঙ্গল; এবং তৃতীয় খণ্ড — মানসিংহ - অন্নপূর্ণামঙ্গল। তিনখণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক ক্ষীণ; কাব্যের যোগসূত্র হচ্ছেন আসলে অন্নদা, অন্নদার কৃপায় ভবানন্দের ভাগ্যোদয়, এই হল কাব্য কথা।*

প্রথম খণ্ডে দেবদেবীর বন্দনা ও কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনের পরে গীতারম্ভ — সতীর দেহত্যাগ, উমার জন্ম, শিববিবাহ, ক্রমে দেবীর অন্নপূর্ণামূর্তি ধারণ, শিবের ভিক্ষা যাত্রা, কাশী প্রতিষ্ঠা, ব্যাসের শিবনিন্দা প্রভৃতি শিবায়নের ও মঙ্গলকাব্যে বিষয় বর্ণনাতেই চৌদ্দ আনি শেষ। তারপরে তাড়াতাড়ি আসে হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, এবং ভবানন্দের জন্ম;— হরিহোড় দেবীর অনুগ্রহে

লক্ষপতি হয়েছিল, তাকে ছেড়ে দেবী চললেন নদী পার হয়ে ভবানন্দের গৃহে। অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রার এই প্রথম খণ্ড শেষ।"[১৭] এই প্রথম খণ্ডে নরনারীর অন্তর্জীবনের প্রকাশ কিভাবে আমরা পাই, তা-ই আলোচ্য অধ্যায়ের মূল বক্তব্য।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেবী অন্নদার উগ্র মূর্তি আমরা লক্ষ করিনি; ''*... অন্নদামঙ্গলে দেবীর দাক্ষিণ্য-বরাভয়ের মধ্যে মাতার স্নেহ গলিয়া পড়িয়াছে। তিনশত বৎসরের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, জগন্মাতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য যুগের প্রান্তসীমায় ভারতচন্দ্র এই মাতৃমূর্তির বন্দনা গাহিয়াছেন। কাহিনী রচনা কোন দৈবাদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশকেই শিরোধার্য করিয়াছে। দেবীর সন্তুষ্টিবিধান বা মঙ্গলকামনা অপেক্ষা এইখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তুষ্টি ও রাজপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়াছে। বস্তুত একটি রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত দৈবী মহিমার কাহিনী মিশাইয়া, নাগরসংস্কৃতিসুলভ একটি আদিরসপ্রধান প্রণয়োপাখ্যান যুক্ত করিয়া বিদগ্ধ ভাষা-ছন্দের অভূতপূর্ব ঝংকারে যে মিশ্রকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই অন্নদামঙ্গল...*"[১৮]

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে যে যুগের পরিচয় পাওয়া যায় তা দৈববিশ্বাসের যুগ নয়। দেবতা যেন সমস্ত কিছুর পিছনে পূর্বের ন্যায় কলকাঠি আর নাড়তে পারছেন না। ব্যক্তিমানসের জয়ধ্বনির ঝংকার যেন বেজে উঠেছে। ভারতচন্দ্র তাঁর মঙ্গলকাব্যে একটা স্বতন্ত্রতা যেন নিয়ে এসেছেন। ''*কাজেই যদিও তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে'-এ তিনি প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের বহিরবয়ব কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি উহার অন্তরাত্মা মধ্যযুগীয় ভক্তি ও বিশ্বাসের অন্ধ আতিশয্য হইতে স্বতন্ত্রগুণবিশিষ্ট। অষ্টাদশ শতকে বাংলার ধর্মসংশ্লেষক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত অনার্য দেব-দেবী হিন্দু দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা লোকের মনে সহজ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। নূতন দেবতার অনুপ্রবেশে সমাজমনে যে উত্তেজনা ও তীব্র বিরোধের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা কালক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। নবাগত দেবতারা প্রাচীন দেবমণ্ডলীর সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন ও আর কোন নূতন পূজার দাবি সমাজ শান্তিকে বিচলিত করে নাই। নূতন দেবতার পূজাবিধি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজের দৃঢ় অসম্মতি ও প্রতিরোধ যদি*

মঙ্গলকাব্যের স্বরূপলক্ষণ হয়, তবে ভারতচন্দ্রের কাব্য মোটেই মঙ্গলকাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী ভারতচন্দ্রে আসিয়া অতিপরিচিতা, কল্যাণময়ী সমাজাধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবীর সহিত অভিন্না অন্নপূর্ণা বা অন্নদামূর্তিতে বিবর্তিত হইয়াছেন। যিনি এককালে অন্ত্যজ জীবনের সুড়ঙ্গপথে বা অন্তঃপুরিকাদের নিভৃত ব্রত-অর্চনার মাধ্যমে আমাদের ভক্তি রাজ্যসীমায় প্রবেশের কুণ্ঠিত আবেদন জানাইয়াছিলেন তিনিই প্রায় দুই শতাব্দীর অনুশীলনের ফলে সাড়ম্বর পূজাবিধির প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া আমাদের ধর্মবোধের কেন্দ্রাধিষ্ঠিতা দেবীতে রূপান্তরিতা হইয়াছেন। যিনি বিপরীত স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ও জনচিত্তের সংশয়ভীরু অভ্যর্থনার বাধা কাটাইয়া কোন মতে অনিচ্ছুক স্বীকৃতির অঘাটায় নৌকা বাঁধিয়াছিলেন তিনি এখন পূজাবেদীর ঠিক মাঝখানটিতে নিজ অভ্যস্ত আসনটি সর্বসম্মতিক্রমে অধিকার করিয়াছেন। চণ্ডী দেবীর দ্বিধা-বিভক্ত সত্তার চণ্ডী-অংশ কালীর আপাত-নিষ্করুণ, রহস্যময় আচরণে ও উহার স্নিগ্ধ অংশ জননী-রূপিনী দুর্গার বরাভয়দানকারী, অজস্র বাৎসল্য-প্রশ্রয়ে হিন্দু ধর্মচেতনার অকুণ্ঠ অনুমোদন লাভ করিয়াছে ও ধর্মানুমোদিত ভক্তিসাধনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। কাজেই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে যে দেবীর প্রশস্তি রচনা হইয়াছে তিনি ইতিমধ্যে সর্বসংশয় মুক্তরূপে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের কুলদেবতায় পরিণত হইয়াছেন।"[১৯] যে দেবীকে কেন্দ্র করে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছে, তিনি আসলে কোন দেবী, তার পরিচয় কি? তার সৃষ্টিই বা কী করে হল, এই সমস্ত বিষয় জেনে নেওয়া আমাদের অত্যন্ত জরুরী। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেবী অন্নদার স্নিগ্ধ শান্তরূপই আমাদের কাছে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

মঙ্গলকাব্যে লক্ষণীয় বিষয় হল যে, দেব-দেবীকে খুশি করে পার্থিব জীবনে সুখের কামনা করা, আমরা জানি বিশেষ করে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচার করার উদ্দেশ্যেই মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে; কিন্তু 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লক্ষ্য করা যায়, দেবী অন্নদা মানুষের কাছে সহজেই দেবী বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তার জন্য তাঁকে কোন চাপ সৃষ্টি করতে হয় নি। আসলে মানুষ এবং দেবতার সম্পর্ক হয়তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সহজ হতে শুরু করেছিল। কারণ পরিবর্তন, রূপান্তর জীবনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন বা রূপান্তর করতে না পারলে পিছিয়ে থাকতে হয় চিরজীবন। আর জীবন আমাদের এগিয়ে যাবার কথা বলে, পিছিয়ে পড়ার কথা বলে

না, সাহিত্য বরাবরই এগিয়ে যাবারই কথা বলে চলেছে।

সাহিত্যে মানুষের জীবনের ছবিই তুলে ধরা হয় বিচিত্র রং-এ, বিচিত্ররূপে। একঘেয়ে জীবন চলার ধারণাকে কবি ভারতচন্দ্র যেন পাল্টাতে চেয়েছেন। তাই ''*অন্নদামঙ্গল কাব্যে লক্ষ্য করছি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি কাব্য রচনা করেছেন, তাঁকে খুশি করে ঐহিক সম্পদ লাভ তাঁর উদ্দেশ্য। অন্নদাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের অছিলায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের গৌরব গাথা রচনা করেছেন।*''[২০] কবি ভারতচন্দ্র নিজের জীবনে অশেষ কষ্ট উপভোগ করেছিলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গিয়ে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাই তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনায় কলম ধরেন। মানবধর্মে দীক্ষিত কবি ভারতচন্দ্র একদিকে যুগ সৃষ্ট এবং অন্যদিকে যুগস্রষ্টাও। একটা যুগ তাঁর সৃষ্টি করেছে, আরেকটা যুগকে তিনি সৃষ্টি করেছেন; যে যুগ মানবতার জয়গান গেয়েছে। ''*খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক সবদিক দিয়াই স্মরণীয়। জীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য — সবক্ষেত্রেই এই যুগে একটি বিরাট দিক্ পরিবর্তন হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের অন্তিমক্ষণ এবং ইংরেজ রাজত্বের পত্তন — এই দুইয়ের সন্ধিলগ্নে পাইতেছি কবি ভারতচন্দ্রকে। পলাশীর যুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিচার হইয়া গেল, ... বিলীয়মান মোগল সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং উদীয়মান ইংরেজ শাসন-বন্দোবস্ত — এই অস্তোদয়ের প্রত্যক্ষদর্শী কবির রচনা মধ্যেও দেখি নূতন ও পুরাতনের সেতুবন্ধ, পরিবর্তনের সুরঝংকার।*''[২১] বিপন্ন জীবনের, দুর্যোগপূর্ণ কালের দলিল হয়ে উঠেছে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে স্থান পেয়েছে মানুষের জীবনের কথা।

কবি ভারতচন্দ্র সময় এবং সমাজ উভয় দিকেই সচেতন ছিলেন। সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া নানা ধরনের সঙ্গতিহীন পরিস্থিতি, অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা কবির মনকে নানাভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই সমস্ত অবস্থা তাকে কখনও আত্মতৃপ্তি দান করেনি, তিনি বুঝতে শিখলেন যে শুধু দেবতাকে স্মরণ করে এই সব পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। মানুষকে নিজেই সচেতন হতে হবে। মানুষের ভবিষ্যত যেন একটা সংশয়ের প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। দেশ-কালকে উপেক্ষা করা চলে না, দেশ-কাল যেভাবে সমাজে মানুষকে গঠন করেছে, কবিরাও তেমনিভাবেই মানুষকে গঠন করেন, মানুষের জীবনকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে বদ্ধ পরিকর। ভারতচন্দ্রও

সেই বদ্ধপরিকরের কাজই করেছেন। ''*অন্নদামঙ্গল-এ একটি আত্মপরতন্ত্র ব্যক্তিপ্রতিভা এমন একটি ব্যক্তিজীবনের বিজয় কথা বর্ণনা করেছে, যে সর্বপ্রকার দৈবী মহিমা-বিবর্জিত নিছক চাতুর্য-কলা-কুশল আধিভৌতিক সমৃদ্ধি-সিদ্ধ এক ব্যক্তি-মানুষ। এই ব্যক্তিসর্বস্বতা এবং এই মানবিকতা, individuality এবং humanity-ই নবযুগের লক্ষণ।*''[২২] নবযুগ এসে আমাদের সামনে নবজীবনের ডাক দিচ্ছে। নবজীবনে যেন শান্তি বিরাজ করে।

কাব্যের শুরুতেই লক্ষ করলে দেখা যায়, কবি বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা করেছেন কারণ, হয়তো অশান্ত পরিবেশ থেকে শান্তি জীবনে যেন নেমে আসে। সাহিত্য চিরকালই দেশ-কাল নির্ভর। আর 'অন্নদামঙ্গল' যে কালে রচিত হয়েছিল সেই কালটি এক অস্থিরতার কাল। পলাশীর যুদ্ধ, বর্গি আক্রমণ, নবাবীর পতন, অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর, মন্বন্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর বিপ্লব বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান প্রকোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর অঙ্গনে চারিদিকে শুধু অন্নের জন্য হাহাকার দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় মানুষ বাকশূন্য — যেন একটা যুগের সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। এই পটভূমিতে দেবী অন্নদাকে কেন্দ্র করে কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য সৃষ্টি করেন।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র হিসেবে দেবী অন্নদাকে অঙ্কন করেছেন কবি। এই কাব্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসেছেন সতী, উমা, পার্বতী এবং পরবর্তিতে অন্নদা। সমাজে নরনারীর অন্তর্জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় বা অবস্থা কিরূপ ছিল তা এই ভিন্নরূপের মাধ্যমে সহজেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। রাজা দক্ষের কন্যা সতীর বিবাহ হয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে; কিন্তু জামাতার এখন বাঘের ছাল বেশভূষা দেখে শ্বশুর দক্ষ সবসময়ই জামাই নিন্দায় মুখর থাকেন। নিজের স্বামী যেরকমই হোন তার নিন্দা কোন স্ত্রীই বরদাস্ত করতে পারেন না, তাছাড়া সেকালে স্বামী ছিলেন পরমেশ্বর তার নিন্দা শুনাও মহাপাপ। তাই শিব শ্বশুরের এরূপ আচরণে বিরূপ হয়ে বিয়ের দিনই সতীকে নিয়ে কৈলাসে গমণ করলেন —

''*নারদ ঘটক হয়ে নানামত বলে কয়ে*
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বামমতি।।

সদা শিব নিন্দা করে মহাক্রোধ হৈল হরে

সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে।"[২৩]

কৈলাসে গিয়ে শিবের সংসারে সতীর প্রবেশ ঘটল। সতীর সতীত্ব আমাদের সকলেরই জানা। পিতা দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন, কিন্তু এই যজ্ঞে জামাতা শিবকে আমন্ত্রণ জানালেন না। কারণ জামাতা শিব তার অপছন্দ। তাহলে এখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন মনে জাগতে পারে যে জামাতা শিব যদি দক্ষের এতই অপছন্দ তাহলে এমন পাত্রের হাতে কন্যা সতীকে কেন দান করলেন ? কারণ হয়তো একটাই সেকালের সমাজ। সমাজের কঠোর নিয়মে সেকালের কন্যাদায়গ্রস্থ পিতারা জর্জরিত। তাই পাত্র অপছন্দ বা পছন্দ সেটা না দেখেই কন্যাকে পাত্রস্থ করে সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতেন পিতারা। দক্ষও সেই কারণেই শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহে রাজী নন। বিয়ের পর কন্যার বাপের বাড়িতে আসা, তাতেও অনেক বাধা নিষেধ। আর যেখানে স্বামীর নিমন্ত্রণ নেই, সেখানে যাওয়া আরও কঠিন। সতীকে কঠিন কাজটাও করতে হতো। বাপের বাড়িতে যাবার জন্য তার মন আকুল। স্বামী শিবের আদেশ নিয়েই তাকে সেখানে যেতে হবে। বিয়ের পরবর্তীজীবনে স্বামীই নারীর সবকিছু। তাকে অমান্য করে কোথাও যাওয়া চলবে না। বাপের বাড়িতে যেতে হলে নিমন্ত্রণেই যেতে হয়; কিন্তু সতী মনে করেন যে বাপের বাড়িও তার নিজের বাড়ি তার জন্য নিমন্ত্রণের দরকার নেই, সমাজ তা মানে না। তাই স্বামীর কাছে সতী বাবার ঘরে যাবার জন্য কাতর আবেদন করেন —

"*নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।*

যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন।।

শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাব।

নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে।।

যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম।

আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম।।

সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা।

বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা।।

যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।

ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ।।"[২৪]

স্বামী অনুমতি না দিলে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর ক্রোধ হয়, আর বাপের বাড়িতে যাবার অনুমতি না দিলে সেই ক্রোধ আরও দ্বিগুণ বেগে প্রকাশিত হয়। তাই সতীও বাপের বাড়ি যাবার অনুমতি না পেয়ে খুব ক্রোধান্বিত রূপ ধারণ করলেন। তাতে মহাদেব ভয় পেয়ে গেলেন এবং সতীকে বাপের বাড়িতে যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। "*দুহিতারূপে সতী অনন্যা। তাঁর মধ্যে কোন কুটিলতা, জটিলতা বা চতুরতা নেই। তিনি আকৃতিতে দেবী হলেও প্রকৃতিতে খাঁটি বাঙ্গালী ঘরের কন্যা। পিতার প্রতি অন্ধবিশ্বাস এবং মাতার প্রতি অগাধ ভালবাসা তাঁর বিশেষ গুণ। পিতা যে ইচ্ছাপূর্বক তাঁদের যজ্ঞোৎসবে নিমন্ত্রণ করেন নি — একথা তাঁর ভাবতে যেমন কষ্ট হয়, বিশ্বাস করতেও তেমন অবাক লাগে। স্বামীকে দেবসমাজে অবজ্ঞা ও অপমান করার জন্য যে এই যজ্ঞোৎসবের আয়োজন তা সতীর বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে। সতী স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেছেন। দূরদর্শী শিব একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সতীকে পিত্রালয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। সতী স্বামীর কথায় কর্ণপাত করেন নি। তিনি জেহাদ ঘোষণা করে, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। জায়ারূপে সতীর চরিত্রে ত্রিবিধ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কখনও স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন। কখনও স্বামীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে নারী অধিকারের পথিকৃৎ রূপে নিজেকে জাহির করেছেন। আবার কখনও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ-ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা নির্ভরতার উৎকর্ষ দেখিয়ে নিজেকে আদর্শ স্ত্রীরূপে প্রতিপন্ন করেছেন।*"[২৫] আদর্শ স্ত্রীরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন বলে স্বামীর অনুমতিতেই বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন সতী। পিতা দক্ষরাজ সতীর কালো বর্ণ দেখেই ক্রোধে শিবের নিন্দা শুরু করলেন —

"*সভাজন শুন জামাতার গুণ*

বয়সে বাপের বড়।

কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই

সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।।

মান অপমান সুস্থান কুস্থান

অজ্ঞান জ্ঞান সমান।

নাহি জানে ধর্ম্ম নাহি মানে কর্ম্ম

চন্দনে ভস্মজ্ঞেয়ান।।

যবনে ব্রাহ্মণে কুক্কুরে আপনে

শ্মশানে স্বরগে সম।

গরল খাইল তবু না মরিল

ভাঙ্গড়ের নাহি যম।।

সুখে দুঃখ জানে দুঃখে সুখ মানে

পরলোকে নাহি ভয়।

কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে

সদা কদাচারময়।।

কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ

বেদাচার বহিষ্কৃত।

... ...

গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়

না করে অতিথিসেবা।।

সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার

সন্ন্যাসী বলিবে কেবা।।

আহা মরি সতি কি দেখি দুর্গতি

অন্ন বিনা হৈলা কালি।

তোমার কপাল পর বাঘছাল

আমার রহিল গালি।।"[২৬]

পিতা দক্ষ এভাবে নিন্দনীয় বাক্যে জামাতা শিবের অপমান শুরু করলেন তাতে সতী ক্রোধান্বিত হলেন। সমাজে যাতে নিজের স্থান উঁচুতে থাকে সেই কারণে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা দক্ষ কন্যার বিয়ে দেন শিবের সঙ্গে; কিন্তু এখন নিজেই সেই জামাতার নিন্দায় মুখর হয়েছেন। তাই সতীর আরও বেশি ক্রোধ হয়। জামাতা শিব দক্ষের নিকট শুরু থেকেই অপছন্দ। সতীকে দেখে তাঁর মনের ক্ষোভ ফেটে বেরোয় —

"*মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে*

ছি ছি এ কি দশা তোর।

আমি মহারাজ তোর এই সাজ

মাথা খেতে আলি মোর।।

বিধবা যখন হইবি তখন

অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।"[২৭]

স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় বিধবা হবার কথা পিতা হয়ে দক্ষ তাঁর কন্যা সতীকে বলেছেন অর্থাৎ যে স্ত্রীর স্বামী মৃত সেই বিধবা। তাই স্বামী মহাদেব মৃত হলেই দক্ষ বিধবা কন্যাকে সবকিছু দেবেন। এই কথা শুনে কোন পতিব্রতা নারীই আর বেঁচে থাকতে চাইবে না, সতীও পিতা দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে দেহত্যাগ করলেন। যুগ যুগ ধরে নারীকে এভাবেই আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। আত্মাহুতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম স্থানাধিকারী নারীরাই; কিন্তু নারীর এভাবে আত্মাহুতি কিছু কিছু পুরুষের ক্ষেত্রে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাঁরা তাঁদের জীবনে নারীকে এক উঁচু আসনে বসিয়েছেন — শিবেরও এভাবে সতীর দেহত্যাগ গ্রহণযোগ্য ছিল না।

মহাদেব দক্ষালয়ে গমন করে সেখানে শোকে-দুঃখে কাতর হয়ে রোদন করতে করতে মহারুদ্ররূপ ধারণ করে তাণ্ডবলীলা শুরু করেন। তাতে সকল দেবদেবীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যান। তিনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করে দিলেন। এবারে তিনি শ্বশুর দক্ষকে প্রাণে মেরে ফেলেন; কিন্তু পরবর্তিতে

শাশুড়ি প্রসূতির বাক্যে শিব রাজা দক্ষের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য যে এক নারী সতী তাঁর স্বামীর নিন্দা শুনে আত্মত্যাগ করেন, আর আরেক নারী প্রসূতি যে স্বামীকে মৃত দেখে শিবের কাছ থেকে তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে নেন। স্বামীর সঙ্গে জড়িত অনুভূতি সমস্ত নারীরই সমান। তারা স্বামীর চিরতরে চিরজীবন মঙ্গলই কামনা করে আসে। তার বিরুদ্ধে একটিও কটূক্তি তারা সহ্য করতে পারে না। সতীও পারেন নি। স্বামী যে পরমেশ্বর, দেবতা রূপে তিনি পূজিত। কন্যাশোকে প্রসূতিও কাতর, কিন্তু তার থেকেও বড় তাঁর কাছে স্বামীর জীবন। তাই তিনি বলেন জ্ঞ

''সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার।

তথাপি বিধবা দশা হইল আমার।।

ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।

তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি।।

তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।

আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময়।।

প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইলা।

রাজ্য সহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিলা।।''[২৮]

শিব শাশুড়ি প্রসূতির অনুরোধে দক্ষকে ক্ষমা করে তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। নারীর মনে এমনই শক্তি এবং বিশ্বাস থাকে যে এই শক্তি ও বিশ্বাসের মাধ্যমে সে অসাধ্য কর্মকেও সাধিত করে। প্রসূতিও তাই করেছে। এবারে স্বামী শিব সতীর দেহকে নিয়ে নৃত্য শুরু করলেন এবং বিষ্ণু এই নৃত্য বন্ধ করার জন্য সতীর দেহকে একান্নখণ্ডে খণ্ডিত করে দেন। এক একটি স্থানে এই খণ্ডিত দেহ পড়ল এবং সেখানেই সতী পূজিতা হলেন, স্থানটা সতীপীঠ, মহাপীঠ নামে পরিগণিত হয়।

স্ত্রী সতীকে হারিয়ে শিব সংসারে একা, শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। শিবের পুনর্বিবাহের জন্য সম্বন্ধ আসতে শুরু হয়। সতী পরবর্তী জন্মে মেনকার গর্ভে উমা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিবের উদাসীনতা সকলের মনেই চিন্তার উদ্রেক করে —

''উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।

মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর।।

ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব।

শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব।।

নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।

মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব।।

হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা।

মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা।।

উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।

বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার।।

তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ।"[২৯]

তবে বিবাহ তো এত সহজ সাধ্য নয়। বিবাহের ভার দেওয়া হল নারদকে। শিবের সম্বন্ধ নিয়ে তিনি হিমালয়ের নিকট গেলেন। বালিকা গৌরী মৃত্তিকার সাজানো পুতুল দিয়ে বিয়ে বিয়ে খেলছে। বিবাহ ব্যাপারটা বাল্যকাল থেকেই মেয়েদের মনে একটা বিরাট আকর্ষণের সৃষ্টি করে। আসলে সামাজিক পরিকাঠামোই এমনটা করতে আরো ইন্ধন যুগায়, তাই সমাজের প্রতিভূ ঘটক হিসাবে নারদ যখন বিবাহের প্রসঙ্গ তোলেন তখন গৌরী স্বাভাবিকভাবেই লজ্জা পান। একটি মেয়ে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজই তাকে বুঝিয়ে দেয় যে সে মেয়ে। নানা ধরনের বাধা-নিষেধের গণ্ডি দিয়ে তাকে তৈরি করে সমাজ। তাই ''*বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে*''[৩০] মাকে ডেকে আনেন। শুরু হয় বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা –

''*হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে।*

সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে।।

নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়।

কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়।।

এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে।

অখিল ভুবনমাতা জানিতে কে পারে।।

বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ কিবা।

শিব পতি ইঁহার ইঁহার নাম শিবা।।

হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে।

ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে।।

নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।

জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি।।

হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।

লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়।।"[৩১]

সে সময়ের সমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা সবসময়ই কন্যার বিবাহ নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। গৌরীকে নিয়ে হিমালয়-মেনকাও চিন্তিত ছিলেন, কারণ সঠিক সময়ে বিবাহ না দিলে সমাজের ভয়, একঘরে থাকার ভয় মানুষকে তাড়া করত। অল্পবয়সেই মেয়েদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া হত। শিবের মত পাত্রের সম্বন্ধ যখন গৌরীর জন্য আসে তখন গৌরীর পিতা ও মাতা উভয়েই খুব আনন্দিত হলেন। তবে বিশেষ করে মা মেনকা খুব বেশি চিন্তাগ্রস্ত। "*একমাত্র কন্যা গৌরীকে নিয়ে তাঁর চিন্তার অন্ত নেই। তিনিও আর পাঁচজন রমণীর মত চান – তাঁর মেয়ের ভাল বর জুটুক।*"[৩২] তাই তিনি শিবের কথা শুনেই না দেখেই বিয়ের জন্য রাজি হয়ে যান। তখনকার সমাজে কৌলীন্য প্রথার ফলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতারা কুলীন জামাতা পেলে এভাবেই বিবাহের জন্য রাজি হয়ে যেতেন।

অন্যদিকে, সতীকে হারিয়ে শিব ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য সব দেবতারা মিলে চেষ্টা করতে লাগলেন, কারণ শিবের বিবাহ ঠিক হয়েছে। সকলেই এই সংবাদে পরম আনন্দিত। হরের ধ্যান না ভঙ্গ হলে বিবাহ কিভাবে হবে এই নিয়ে সকলেই চিন্তিত। মদনদেবতা কামের শর দিয়ে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে দিলেন, তাতে শিব ক্রোধান্বিত হয়ে মদনকে অগ্নির বাণে ভস্ম করে দিলেন। স্বামী মদনকে হারিয়ে স্ত্রী রতি বিলাপ করছেন। কারণ স্বামী ছাড়া

স্ত্রীর জীবন শূন্য –

''পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে

ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।

কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে

কাম-অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে।।

আলু থালু কেশবাস ঘন ঘন বহে শ্বাস

সংসার পূরিল হাহাকার।

কোথা গেলা প্রাণনাথ আমারে করহ সাথ

তোমা বিনা সকলি আঁধার।।

তুমি কাম আমি রতি আমি নারী তুমি পতি

দুই অঙ্গ একই পরাণ।।''[৩৩]

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমনই যে সাত পাঁকে বাঁধা পড়ার পর তারা দুই অঙ্গ ঠিকই, কিন্তু তাদের হৃদয় এক, একে অপরের হৃদয়ে নিজেকে স্থান দেন। সতীকেও শিব খুব ভালবাসতেন, তাই সতী নেই একথা তিনি যেন মানতে পারছেন না, নিজের দুঃখ-শোক ভুলে থাকবার জন্য তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন। ''*অষ্টাদশ শতকে যখন দেবভক্তি ক্ষীয়মান, তখন ভারতচন্দ্র যুগসচেতন কবির মত দেবতার প্রতি সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। যে শিব স্বয়ং চিৎশক্তির আধার ভারতচন্দ্র তাঁকে মর্ত্যের ধূলিধূসরিত চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। শুধু তাই নয়, তার চরিত্রে আরোপ করেছেন কুলীন ব্রাহ্মণের চরিত্র – যে কামোন্মত্ত, হতদরিদ্র ও শিথিল সংস্কৃতির প্রতিভূ।*''[৩৪]

শিব একেবারেই বাস্তব মানবায়িত চরিত্র হয়ে উঠেছেন। বৃদ্ধ বর শিবের জন্য নারদ বালিকা বধূ উমাকে ঠিক করেছেন। প্রথমতঃ গিরিরাজ ও মেনকা উভয়েই এই বিয়েতে সায় দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তিতে অন্য চিত্রই লক্ষ করা যায়। শিবের বিবাহকে কেন্দ্র করে চারদিকেই আনন্দরব। নারদ শিবকে বর হিসেবে সাজিয়ে তুললেন এবং শিবের বিবাহের বরযাত্রীরাও শিবের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত। ''*বলদে চেপে শিঙ্গা ফুঁকতে ফুঁকতে আগত বরকে আসতে দেখে কন্যার বাড়ির*

লোকেরা হতবাক্ হল। এই অবস্থাতেই বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হল।''[৩৫] বরের সমস্ত অঙ্গ বাঘছালে আবৃত, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায়ই তিনি বিবাহ করতে এসেছেন। বালিকা কন্যা গৌরীর জন্য এমন বর দেখে মা মেনকার চিন্তা কমে নি বরং আরো বেড়েছে। এমন অদ্ভুত চেহারার বরের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ হলে কন্যার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। নারদ এমন বরের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন, পূর্বের আনন্দময় পরিবেশের কথা স্মরণ করে মেনকার অন্তর্গহনে বেদনার উদ্রেক হয়; কিন্তু এমন সময় শিবের চেহারা উন্মোচিত হল যে কি করবেন না করবেন মন স্থির করতে পারছেন না। সকল নারীরাই শিবকে দেখে নিন্দা করতে লাগলেন। তখন মেনকা নারদকে কটূবাক্যে সম্বোধন করলেন –

''*হেন বর কেমনে আনিলে চক্ষু খেয়ে।।*
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদের কথায় করিল হেন কাজ।।''[৩৬]

নারীদের মন সবসময়ই কোমল। এই কোমলমন বাস্তবতার নিষ্ঠুর অভিঘাত এত সহজে বুঝতে চায় না। বিবাহের সম্বন্ধ আসায় খুশি হয়ে প্রথম অবস্থায়, স্বামী গিরিরাজ রাজী হয়েছেন দেখে, স্ত্রী মেনকাও তাতে সায় দিলেন। স্বামী পরমেশ্বর তার বাক্যই শেষ বাক্য, স্ত্রী তাতে নিষেধ করলেও তা গ্রাহ্য হয় না। কারণ সে সময়ে কথা বলার, সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার একমাত্র পুরুষেরই, নারীর নয়।

তবে একথাও অনুমেয় যে পিতা হিমালয় সমাজের রূঢ় বাস্তবতার করাল গ্রাসের হাত থেকে বাঁচতেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং শিবকে দেখেও তিনি কোন নিন্দামূলক মন্তব্য করেন নি। আসলে কৌলীন্য প্রথায় একেবারে জর্জরিত, বিমর্ষিত হয়ে আছেন পিতামাতারা। বলা বাহুল্য যে, ''*উমার মা-বাবা কেউই বর (শিব)-কে আগে দেখেন নি – নারদের (ঘটক) কথা শুনেই তাঁরা উমার পাত্র হিসেবে শিবকে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে অন্যরকম করা বা ভাবা কি সম্ভব ছিল? ছিল না। কুল বাঁচাতে এবং দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের অসহায় পিতা-মাতা তাঁদের কন্যাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হতেন।*''[৩৭]

ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েই পিতা গিরিরাজ মাতা মেনকা না দেখে শুনেই কন্যার বিবাহ স্থির করে দেন; কিন্তু পরবর্তিতে শিবকে দেখে মেনকার ক্রোধ, বিবাহে রাজী না হওয়া তা যেন এতকালের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে নারীমনে জমে থাকা ক্রোধ যা বেরিয়ে এসেছে মেনকার মধ্য দিয়ে। কারণ অত্যাচার যেখানে চরমমাত্রায় পৌঁছায় সেখানে অল্প হলেও প্রতিবাদ বাসা বাঁধে। তাছাড়া, ''*কৌলীন্য প্রথার কারণে তখন বিয়ের পাত্রদের অধিকাংশের যথেষ্ট বয়স হত। আর এই বৃদ্ধ পাত্ররা পুনরায় বিবাহ করার জন্য প্রচুর আগ্রহ দেখাত। অল্পবয়সী কন্যারা সমাজের নির্মম প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হত।*''[৩৮]

গৌরী বা উমাও যেন এভাবে বলি প্রদত্ত না হয় তার জন্য মা মেনকার এত ক্রোধ। তবে সমাজের প্রথাগত ধারাকে এত সহজে বদলানো সম্ভব নয়, যুগের পর যুগ এভাবেই প্রথাগত ধারায় আষ্টেপৃষ্ঠে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ আবদ্ধ, বিশেষ করে নারীরা। এই বন্ধন থেকে বের হয়ে আসা অনেক কঠিন কাজ।

গৌরীর মত একটি বালিকার সঙ্গে বৃদ্ধ শিবের বিবাহ কোথাও যেন মিল খাচ্ছে না, অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ তাই মেনকার ক্ষোভ ও অভিমানের বিস্ফোরণ এই বরকে বিবাহ করলে পুষ্পের মত কোমল তাঁর কন্যা গৌরীর জীবনে নেমে আসবে অসহনীয় দুঃখ ও বেদনা। এই দৃশ্য তখনকার সমাজে প্রায় ঘরে ঘরেই লক্ষণীয়। তাই ''*কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।*''[৩৯] স্বামী ও স্ত্রী সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন তা মা মেনকা লক্ষ করছেন; কিন্তু উমার সঙ্গে যে শিবের বিবাহ হতে হবেই তা মেনকার মনে হল। কারণ বিবাহ না হলে সবদিকেই ক্ষতি, তাই –

''*শিব নিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে।*
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে।।
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়।।
হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই।।

কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।

কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ।।

মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।

মনোহর বর হরে দেখিবারে পায়।।

জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণিমণি।

বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণী।।

ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।

মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ।।

হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।

মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই।।

এইরূপে হরগৌরী বিবাহ হইল।

হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল।।

কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ।

ঋষিগণ বেদগানে পুরিল ভুবন।।

কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।

অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর।।

উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।”[৪০]

শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান মেনে উমা এবং শিবের বিবাহ সম্পন্ন হল। শিবের সংসারে উমার প্রবেশ ঘটল, উমাকে পেয়ে শিব খুব আনন্দিত। সতীর মৃত্যুতে শিবের সংসার একেবারে অতল গভীর অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। শিব একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন, শিব উদাসীন থাকলে তো আর জগৎ সংসার চলে না, তাই শিবের উমার সঙ্গে আবার বিবাহ স্থির হয়। শিবও উমাকে ঘরে এনে সমস্ত অন্ধকার দূর করে আলোর প্রকাশ ঘটালেন –

''এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর।।

সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার।।

যদবধি এই সতী দক্ষ যজ্ঞে গিয়া।

ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া।।

তদবধি গৃহ শূন্য সিদ্ধি নাহি জানি।।''[৪১]

শূন্য গৃহে উমার প্রবেশ স্বাভাবিকভাবেই শিবের নিকট পরম সুখের দিন। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের বন্ধন পুনরায় নির্মিত হল। শিব উমাকে বারবার বলছেন তাকে যেন উমা আর কখন ছেড়ে না যান। ভাগ্যের জোরে তিনি আবার উমাকে পেয়েছেন–

''সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর।।

হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।

শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই।।

অর্দ্ধ অঙ্গ তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে।

হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে।।''[৪২]

সেকালের সমাজে লক্ষণীয়, সহমরণ প্রথা, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীও স্বামীর চিতায় গিয়ে উঠে। স্বামী সংসারে না থাকলে, স্ত্রীরও বাঁচার আর কোন অধিকার নাই। স্বামী যেরকমভাবে সংসারের হাল ধরেন, স্ত্রীকেও সেভাবেই তার সঙ্গ দিতে হয়। বিরূপ হওয়ার কোন অধিকার নারীর নেই। তাই শিবও গৌরীকে নিজের মতানুসারেই চালাতে চাইলেন; কিন্তু 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বন্ধনে পুরুষ সবসময়ই উর্দ্ধে থাকতে চায় বা থাকেই; কিন্তু নারী চাইলেও তা করতে পারে না। তাছাড়া পতির প্রতি স্ত্রীর যেরকম মান্যতা করার ভাবনা থাকে, স্ত্রীর প্রতি পতির সেই ভাবনা সমান থাকে না। স্ত্রী মানেই স্বামীর কথামত চলবে, তার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই, সে সবসময়ই পর নির্ভরশীল। আলোচ্য কাব্যে কবি দেখিয়েছেন সেই সময়ের সমাজের মান্য-গণ্য পুরুষের চরিত্রে কি কি ত্রুটি বর্তমান ছিল, যা থাকা একেবারেই অনুচিত। সময়ের প্রবহমানতার স্রোতে ত্রুটিগুলো না সারালে সমাজকে উন্নত করা যাবে না। তাই শিবের

সঙ্গে মিলিত হবার কথায় গৌরী সায় না দিয়ে বললেন–

''হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়।।
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন।।
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে।।
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়।।''[৪৩]

সমাজ-শাস্ত্র সমস্তই পুরুষের সুবিধার জন্য তৈরি, নারীর সুবিধা তাদের কাছে নগণ্য। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর আর বাঁচার কোন প্রয়োজন নেই, আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামী আবার নুতনভাবে বেঁচে ওঠে আরেকজন নুতন স্ত্রী ঘরে নিয়ে আসেন। সমাজই তাকে এমন কাজ করার জন্য সহযোগিতা করে। এমন ব্যতিক্রমী সমাজ-শাস্ত্রের রূপ গৌরী তুলে ধরেছেন। এত ভাবনা নারীর মনে থাকলেও কি হবে, নারী নিজের মত করে তো আর সংসার চালাতে পারে না। স্বামীর সঙ্গে তাল মিলিয়েই তাকে চলতে হবে। সমাজ বাস্তবতার এমন ভয়াবহ রূপ নরনারী উভয়ের জীবনেই প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে নারীর জীবনে। কারণ সমাজ ক্রুর বাস্তবের নির্বিচারে বলির শিকার নারীরাই। শাস্ত্র-সমাজ তো এভাবেই গঠিত। নারীর আর কোন উপায় নেই। গৌরীরও ছিল না, তাই –

''হর গৌরী এক হই ইতে নাহি আন।।
দুইজনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে।।
এইরূপে হরগৌরী করেন বিহার।''[৪৪]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সংসারের সূচনা হল ঠিকই; কিন্তু সংসার তো আর শুধুই কথা দিয়ে চলে না, তার জন্য খাদ্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। সেখান থেকে হর-গৌরীর জীবনে বিবাদের সূচনা। সংসারে অভাব থাকলে কোন দাম্পত্য সম্পর্কই সুন্দরভাবে মসৃণ পথে এগিয়ে যেতে পারে না। শিব ভিক্ষা করে বাড়ি বাড়ি ঘুরেন, যৎসামান্য যা ভিক্ষা পান তা পেটপুরে খান। তাতে সংসারের অভাব মিটে না। দারিদ্র্য-অসহায় অবস্থায় সংসার একেবারে জর্জরিত। লজ্জা ঘুচিয়ে শিব পথে নেমেছেন ভিক্ষা করতে শুধুমাত্র পেটের তাগিদে। বাঁচার জন্য তো নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হয় –

‘‘শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।

ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি।।

নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।

সাদ করে একদিন পেট ভরে খাই।।

সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।

সরম ভরম গেল উদরের লেগে।।

ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।

তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল।।

আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।

কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ।।

নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।

ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী।।

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।’’[৪৫]

শিবের সংসারে এভাবেই ধীরে ধীরে বিবাদ-কোন্দলের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি ঘরে ঘরেই তখন এই দৃশ্য ছিল। কারণ খাদ্যের অভাব মানুষকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরেছে। মানুষ চাইলেও এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না, সমস্ত বঙ্গভূমিতে এই একই আবহের সৃষ্টি

হয়েছে। শিব কুলীন, কুলীনদের কোনসময়ই উপার্জনের চিন্তা করতে হয় নি। কুলীন প্রথানুসারে এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকতেন। পুরুষরা স্ত্রীদের বাপের বাড়িতে গিয়ে সুখে দিন কাটিয়ে দিতেন; কিন্তু শিবের ভাগ্য এরকম নয়, বিধাতার লিখন তিনি খণ্ডাতে পারেন না। কুলীন হয়ে সবাই সুখে থাকে আরামে থাকে, তাকে কুলীন হয়েও কত কষ্ট করে ভিক্ষা করে দিনযাপন করতে হয়েছে। কারণ সমাজ বদলাচ্ছে এখন কুলীনকেও অর্থ উপার্জন করে সংসার প্রতিপালন করতে হয়।

একটি মেয়ে যখন বিবাহ করে বাপের বাড়ির সবাইকে ছেড়ে স্বামীর হাত ধরে শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করে তখন মেয়েটির সমস্ত দায়ভার স্বামীকেই নিতে হয়। তাকে সামর্থ্যমত সমস্ত সুখও দিতে হয়। ''*গৃহস্বামীর প্রাথমিক দায়িত্ব হল উপার্জন করে সংসার প্রতিপালন। কিন্তু আঠারো শতকে সেই রোজগারের পথটি সাধারণ মানুষের কাছে খোলা ছিল না। ...*

... সেখানে কেবলই দারিদ্র্য-অন্নের জন্য হাহাকার। ... অন্নদামঙ্গল কাব্যে চিত্রিত হয়েছে অন্নহীন মানুষের ছবি ...। শিবের সংসারে তাই দেখা গেল বাঙালির নিত্য-অভাবের বেদনাময় ছবি।''[৪৬] গৃহস্বামীর প্রাথমিক দায়িত্বপালনে শিব সক্ষম হতে পারছেন না। সমাজের প্রথাসিদ্ধ ধারণা তাকে সে কর্মে বাধা দিচ্ছে। তিনি মনে করেন যে অন্য আরো কুলীনের মতো শুধু আরামে বসে থাকবেন, ঘরের সব দায় দায়িত্ব স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেবেন, কিন্তু গৌরীর মত স্ত্রীকে পেয়ে তার এমন ধারণা বদলে যায় –

''*সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।*
রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায়।।
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর।।
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা।।
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।

আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়।।

পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।

স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র।।

এইরূপে দুইজনে বাড়িছে বাকছল।"[৪৭]

অভাব-দুঃখের জ্বালায় সংসার একেবারে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। শিবের মত পাত্রের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ হওয়ায় গৌরীর জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অভাবের জ্বালায় জর্জরিত; তাই কোন্দল আরও বাড়ছে –

"*কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া।*

এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে।।

আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই

কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।

দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি

কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে।।

বিষপানে নাহি লয় কথা কৈতে ভয় হয়

উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।

মা বাপ পাষাণ-হিয়া ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া

ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে।।"[৪৮]

অন্নের অভাবে সন্তানরা কষ্ট পাচ্ছে। কথায় ভুলিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ হচ্ছে না। সংসারে দ্বন্দ্ব আরও বাড়ছে। "*শিব-পার্বতীর সাংসারিক জীবনযাত্রায় ধরা পড়েছে সমাজের বৃহত্তর অংশের জীবন যাপনের ছবি – যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের নানা চিহ্ন ধরা আছে – শিবকে সেখানে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয় অন্নের জোগাড়ে ...* "[৪৯] বাঙালি জীবনে অন্ন একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অন্নের অভাবে মানুষ হাহাকার করছে। "*অন্ন মহৎ, প্রাণি-মাত্রকেই জীবনধারণের*

জন্য অন্নের উপরে ভরসা করতে হয়, কারণ অন্ন বিনা প্রাণরক্ষাই হয় না।"[৫০] অন্নের জন্যই শিব-গৌরীর মধ্যে বিবাদ চলছে। স্বামী নিজেকে দোষারোপ না করে স্ত্রীকে দোষারোপ করছেন যে, স্ত্রীর ভাগ্যের জন্যই তার ধন নেই, ঘরে অন্নের অভাব, কিন্তু গৌরীও শান্ত হয়ে বসে থাকার নারী নন, তাঁর মুখে শোনা গেল স্বামীকে উচিত বাক্যে তিনি বিদ্ধ করছেন। সমস্ত দোষই গৌরী তাঁর মাথায় চাপিয়ে নেবেন এমন গুণ তাঁর নেই, বরং স্বামীকেই ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে নিজের দোষ অন্যের মাথায় চাপানো যায় না –

"*শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।*

ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটমোচনে।।

শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।

আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল।।

হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।

চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী।।

গুণের নাহিক সীম রূপে ততোধিক।

বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক।।

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।

রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি।।

কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।

কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া।।

আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।

উঁহার কপালে সব হয়েছে নন্দন।।

কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।

কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়।।

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।

মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই।।

গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বড় হয়ে।

গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে।।

... ...

তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।

তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ।।

উঁহার ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।।"[৫১]

শিবের বিবাহের পূর্বেও ধনসম্পদ ছিল না, এখনও নেই। তাতে স্ত্রী পার্বতীর কোন ভাগ্যের দোষ থাকতে পারে না। স্ত্রী যখন স্বামীর ঘরে থাকেন তখন স্বামীর একান্ত কর্তব্য তাকে সমস্ত সুখ প্রদান করা। স্বামী-সোহাগের প্রতীক স্বরূপ শাঁখা, শাড়ি, সিন্দুর; কিন্তু স্বামী শিব তারও জোগান উমাকে দিতে পারছেন না। পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে –

''*তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে।।*

শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।

নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া।।"[৫২]

শিব তার স্ত্রী পার্বতীর সাধারণ চাহিদাটুকুও মেটাতে অসমর্থ। এমন সংসারে স্ত্রী কিভাবে থাকবেন? তা সত্ত্বেও নারী সর্বংসহা বলেই, আর স্বামীর সর্বাবস্থায়ই স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে হয়। সাত পাঁকে বাধিত হওয়ার সময়ই এই শব্দগুলো মন্ত্রোচ্চারণে অন্তর্জীবনের অন্তর্গহনে গ্রথিত হয়ে যায়। তাই স্ত্রী উমাও সংসার ধরে রেখেছেন। এভাবে সংসার ধরে রাখলে কলহ তো হবেই। ''*শঙ্কর ভিখারী, ভিক্ষায় কিন্তু তাঁর পেট ভরে না, পেটের জ্বালায় ছটফট করতে করতে সমাজ-সংসারকে তিনি বিষাক্ত দেখেন। বিষের জ্বালার চেয়ে বড় পেটের জ্বালা ... দেবীরও আর সহ্য হয় না। রাজার মেয়ে ভিখারীর ঘরে পড়েছেন।*"[৫৩] অভাবের তাড়নায় সংসারের সকলেই তিক্তাক্ত হয়ে উঠেছেন। যেখানে সমস্ত কিছুই বেদনাদায়ক। এমন অবস্থার জন্য স্বামী শিব স্ত্রীর

কাছে বারবার তিরস্কৃত হচ্ছেন। ক্ষুধার জ্বালায় শিবের গলা তিক্ত হয়ে গেছে, তিনি পুনরায় ভিক্ষায় গমনোদ্দ্যগ করলেন। এছাড়া আর কোন গত্যন্তর তাঁর নেই –

''ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব

অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।

নারী যায় স্বতন্ত্ররা সে যেন জীয়ন্তে মরা

তাহারে উচিত বনবাস।।

বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার

চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।

সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়

নাম মাত্র রহিয়াছে সার।।

যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই

কিবা সুখ এঘরে থাকিয়া।

এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর

চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া।।''[৫৪]

শিব ও পার্বতীর জীবনে মনোমালিন্য পর্ব যেন আর শেষ হচ্ছে না। সংসারে অভাব থাকলে কোন দাম্পত্য সম্পর্কই সুন্দরভাবে টিকে থাকতে পারে না। কটূবাক্যে একে অপরকে বিদ্ধ করছেন। শিব কৈলাস ত্যাগ করে যাবেন, কারণ এমন কলহপরায়ণা স্ত্রী ঘরে থাকলে কলহ বাঞ্ছনীয়। শিব যতই সংসারে যোগান দিচ্ছেন খাদ্যের, অভাব যেন আরও বেড়ে উঠছে। সংসারের চারিদিকে শুধু আরও চাই এই কথাই উচ্চারিত হচ্ছে। আসলে মানুষের চাওয়ার তো শেষ হয় না। একটা প্রাপ্তি পূর্ণ হলে, আরেকটা চাওয়ার পাত্র শূন্য হয়ে যায়। এমন ঘরে থেকে শিবের ভাগ্যে সুখ আর আসবে না। সামান্য ভিক্ষা করে সুখের আশা করাও উচিত নয়, তার মধ্যে শিব উপার্জন বাড়ানোর জন্য চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য কোনটাই করতে পারবেন না। বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত শিব কৈলাস ত্যাগ করে চলে গেলে অল্প সুখ পাবেন এই আশা করেন; কিন্তু তাতে পার্বতীর মনে ক্ষোভ আরও

বাড়ল। তিনিও বাপের বাড়িতে গিয়ে সুখ পাবেন এমন ভাবনাই করলেন--

''শিবের দেখিয়া গতি শিবা কন ক্রোধমতি

কি করিব একা ঘরে রয়ে।

বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই

গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে।।

যে ঘরে গৃহস্থ হেন সে ঘরে গৃহিণী কেন

নাহি ঘরে সদা খাই খাই।

কি করে গৃহিণী পনে খন খন ঝন ঝনে

আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই।।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ।

রাজসেবা কত খচমচ।

গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত

ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ।।

হইয়া বিরসমন লয়ে গুহ গজানন

হিমালয়ে চলিলা অভয়া।।''[৫৫]

সমাজে ঘটে চলা অশান্ত পরিবেশের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় সমাজের সাধারণ মানুষরা। শিবের সংসারও এভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আলোচ্য কাব্যে শিব ও পার্বতী *''... আমাদের বাঙালি সমাজের দেখা মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব অনশনে ক্লিষ্ট সাধারণ নরনারী। বাঙালি সমাজের উদাসীন নিষ্কর্মা স্বামী এবং অভাবে জর্জরিতা স্ত্রী। সেইসঙ্গে অবাধ্য উচ্ছন্নে যাওয়া কতকগুলি সন্তান। এই ধরণের পরিবারের কর্তা-কর্ত্রী হলেন শিব ও গৌরী।''*[৫৬] এই অবস্থায় সংসার ছেড়ে যেতেই ইচ্ছা হয় গৌরীর। *''শিবের অহেতুক বাক্যবাণ সহ্য করতে নারাজ গৌরী। তাই আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মত শিবের বাক্যবাণে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন গৌরী। তিনি এই ভিখারীর সংসার কত কষ্টে যে চালাচ্ছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। সেজন্য শিবের তাঁর প্রতি*

কৃতজ্ঞতাবোধ তো নেই-ই, বরং ঠেস দিয়ে কথা?"[৫৭]

আসলে সেকালের সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে সমস্ত কিছুই মুখ বুজে সহ্য করে থাকতে হত, গৌরীর মধ্যে কিন্তু সেই সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে কথা বলার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে পুরুষ বলেই নারীর প্রতি কোন ধরণের কৃতজ্ঞতাবোধ করা চলবে না, কারণ তা সমাজ গ্রহিত কাজ নয়। শিবের এহেন আচরণে গৌরীর সংসারের প্রতি ঘৃণার ভাব এসে যায়। চতুর্দিকে শুধু অভাব আর অভাব। পরিশেষে গৌরী জয়ার উপদেশে অন্নপূর্ণা মূর্তি ধারণ করলেন। অন্নপূর্ণা অন্নের দেবী। সংসারে সমস্ত অন্ন তিনি তাঁর সংসারে নিয়ে এলেন। এবার শঙ্কর কোন গৃহে গিয়েই আর অন্ন পান না, সকলের ভাড়ার শূন্য হয়ে যাচ্ছে। যেখানে শিব অন্নের জন্য যাচ্ছেন, সেখান থেকেই খালি হাতে ফিরছেন –

"ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিয়া।।
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান।।
... ...
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব।।
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল।।
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া।।
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিখারী।
কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি।।
এইরূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর।।"[৫৮]

গৌরী অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ করে সমস্ত অন্ন কৈলাসে নিয়ে এসেছেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন আমাদের মনের জানালায় উঁকি দেয় যে, দেবীর কাছে এত অন্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি কেনই বা এত অভাব অনটনের তাড়নায় কষ্ট সহ্য করতে গেলেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, শিবকে কর্মমুখী করে তোলার জন্যই হয়তোবা অন্নের সন্ধান তিনি পূর্বে দেন নি। কারণ সমাজ বদলে যাচ্ছে, কর্মমুখী না হলে সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব নয়, তাই শিব কুলীন হয়েও কর্মমুখী হয়ে ভিক্ষা করতে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এবারে স্বামীকে গৃহমুখী করতে হবে কারণ স্বামী পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত; বুঝতে পারছেন যে কর্মবিমুখ হয়ে ঘরে আরামে বসে থাকলে অভাব দিন দিনই বেড়ে চলবে। শিব হতাশায় অবসাদগ্রস্থ হয়ে গেছেন –

''ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার

তার কেন বিলাসের সাধ।

যার নারী সুতা সুত সদা অন্ন কষ্ট যুত

সর্ব্বদা তাহার অবসাদ।।

দেখিয়া শিবের খেদ লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ

কেন শিব করল বিষাদ।

অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে

এ বড় মায়ার পরমাদ।।

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে

কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।

যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে

তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা।।

আমার যুকতি ধর কৈলাস গমন কর

আমি যদি সকলি সেখানে।

তোমারে কবার তরে আমি আছিলাম ঘরে

এই আমি যাই সেইখানে।।

এত বলি হরিপ্রিয়া কৈলাসে রহিলা গিয়া

শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।

দেখি অন্নদার সাজ শিবের হইল লাজ

তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া।।

কত কোটি হরি হর পদ্মাসন পুরন্দর

কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।

সুখে নানা রস খায় স্তুতি পড়ে নাচে গায়

দেখি শিব হইলা মোহিত।।"[৫৯]

স্বয়ং লক্ষ্মী শিবকে অন্নপূর্ণার কাছে ফিরে যাবার উপদেশ প্রদান করেন। শিব কৈলাসে ফিরে অন্নপূর্ণাকে দেখতে পেয়ে মোহিত হয়ে গেলেন। অন্নপূর্ণা শিবকে অন্ন দান করলেন। দেবাদিদেব হয়েও শিব অন্নপূর্ণার কাছ থেকে অন্নগ্রহণ করছেন। তাছাড়া শিব অন্নগ্রহণ করলেই তো অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য জনসমাজে প্রচারিত হবে। "*অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়োজন হয়েছিল সমকালীন জীবনের অন্নের অভাব থেকেই।*"[৬০] শিবকে অন্নপূর্ণা অন্ন দান করেন। অন্নপূর্ণা হয়েও এতদিন তিনি শিবকে অন্নদান করতে পারেন নি বরং নিজেও কষ্ট সহ্য করেছেন, শিবকে দিয়েও ভিক্ষা করিয়েছেন। আসলে তারা তো সাধারণ মানুষ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে কষ্ট সহ্য করতে হয় তাই, শিব ও গৌরীকেও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। "*... অন্নহীনতা যুগের লক্ষণ। নিরন্ন মানুষের একমাত্র সম্বল ভিক্ষা করা। শিব সমকালীন যুগের সেই নিরন্ন মানুষের প্রতিনিধি।*"[৬১] সেই সময় সমাজের আর্থিক অবস্থা একেবারেই নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। তখন পারিবারিক কলহ চূড়ান্ত রূপ নেয়। কলহের সমাপ্তি ঘটাতেই শিবকে অন্নপূর্ণা অন্ন দান করলেন –

"*অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।*

অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন।।"[৬২]

অন্ন পেয়ে শিব খুব সুখী। এতদিনের ক্ষুধা জ্বালা সহ্য করতে করতে অন্ন শিবের জীবনে এক প্রধান ভূমিকা লাভ করেছে। খাদ্যের অভাবে জীবনে বাঁচাই দায় হয়ে পড়েছিল। এবারে যখন অন্নের অভাব দূর হয়েছে, তাহলে তো দেবী অন্নপূর্ণাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। কারণ তিনি সমস্ত জগত সংসারের ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্নের যোগান দিয়েছেন। প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যেই লক্ষ্য করা যায় যে, দেব দেবীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য অনেকভাবে লড়াই চালিয়ে গেছেন। আলোচ্য কাব্যেও লক্ষণীয়, দেবী অন্নপূর্ণাকে নিজের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য লড়াই চালাতে হয়। কারণস্বরূপ বলা যায়, আধুনিক যুগের সূর্যের আভা অল্প অল্প করে আমাদের নিকটে আসছে – ব্যক্তিচেতনা জাগ্রত হচ্ছে। তাই নিজের স্ত্রীকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য স্বামী শিবই উদ্যোগী হয়েছেন। অন্ন ছাড়া জীবন নেই তা স্বামী শিব ভালো করেই ভিক্ষা করতে করতে বুঝতে পেরেছেন। অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠার জন্য পুরী নির্মাণের ভার দিলেন বিশ্বকর্মাকে –

''বিশ্বকর্ম্মে হর কহিলা সত্বর

শুনরে বাছা বিশাই।

অন্নপূর্ণা আসি বসিবেন কাশী

দেউল দেহ বানাই।।''[৬৩]

বিশ্বকর্মা নিজগুণে কাশীতে অন্নপূর্ণা পুরী নির্মাণ করে দিলেন। অন্নপূর্ণা পুরী নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে আনন্দের সৃষ্টি হল –

''কি এ শোভা হয়েছে কাশী মাঝে।

দেখ রে আনন্দ কানন শোভা।।

সরোবর মনোহর হরমনোলোভা।

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিল।।

চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইল।''[৬৪]

এই শোভিত দৃশ্য দেখে শিব খুব সুখী হলেন। অন্নের এখন আর কোন অভাব হবে না। সমস্ত দুঃখ দূর হবে।

''পাপ তাপ হবে ছন্ন নানা রস সুসম্পন্ন

অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব।।''[৬৫]

সমস্ত দেবগণকে শিব নিমন্ত্রণ করেছেন। শিবের স্ত্রীর এরূপ মঙ্গলময় রূপ দেখে সকলেই খুশী। শিবও হয়েছেন। দেবী অন্নদার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তার আবির্ভাবের আশায় সকলই অপেক্ষমান। ''*প্রকৃতপক্ষে অন্নপূর্ণা তাঁর মূল স্বভাবে হলেন প্রসন্ন - কৌতুকময়ী দেবী; বিবাদ পরায়ণ আত্মপ্রতিষ্ঠান্বেষিণী মঙ্গলদেবীদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি পুরাকাল থেকেই পরমাপ্রকৃতি দেবী হিসেবে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত, তাই লৌকিক মঙ্গলদেবীর মতো দেবমণ্ডলে নিজের স্থান করে নেবার প্রচণ্ড উগ্র শক্তির অলৌকিক লীলায় অপর দেবতার সঙ্গে কোন সংঘর্ষে তাঁকে লিপ্ত হতে হয় নি। বরং মানুষের যথার্থ ভক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গোড়ার সুতীব্র কঠিন শক্তির দেবী চণ্ডী থেকে 'উত্তরোত্তর মধুর, কোমল ও বিচিত্র' পরিণাম রমণীয়তার 'মাতা অন্নপূর্ণারূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে; বিচ্ছেদ বিধুর পিতামাতার কন্যারূপে - মাতা, পত্নী ও কন্যা, রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে' বাঙালীর ঘরে রস সঞ্চার করেছেন।''*[৬৬] নারীর সঙ্গে যে সম্পর্কগুলি জড়িত কন্যা, স্ত্রী, মাতা সমস্ত সম্পর্কের রূপ অন্নপূর্ণার মধ্যে দেখা যায়। সম্পর্কের বেড়াজালে নারীকেই বিশেষভাবে আবদ্ধ থাকতে হয়। অন্নের অভাবে জর্জরিত হয়ে সবাই দেবী অন্নদার আবির্ভূত হওয়ার কামনা করছেন। দেবী অন্নদা আবির্ভূত হলেন এবং সকলের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেন –

''চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুখ।
অনশনে সকলের সুখায়েছে মুখ।।
এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও।
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও।।
এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন।
অন্ন খান সবে সুখে আনন্দসম্পন্ন।।

... ...

ডান করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা।।

কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান।

পরশেন কখন না হয় অনুমান।।

সকলে ভোজনকালে দেখেন এমনি।

আমারে দিছেন অন্ন অন্নদা জননী।।

... ...

সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ।।

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া।

সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া।।

আনন্দসাগরে সবে মগন হইয়া।

প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া।।

অন্নে পূর্ণ হৈল বিশ্ব বিশেষত কাশী।

করিব তোমার পূজা এই অভিলাষী।।"[৬৭]

সেই সময়ের সমাজে অন্নের অভাব এতই বেড়ে গেল যে, মানুষ খেতে না পেয়ে শুকনো মুখে দিন কাটাতে লাগল। দেবী অন্নদার প্রয়োজন বিশেষভাবে মানুষ অনুভব করতে লাগল। আসলে তখন মানুষ পুরোপুরি নিজের উপর বিশ্বাস করতে পারছে না। সমাজে একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ে মানুষ বিধ্বস্ত। বিধ্বস্ত মানুষ তাই বাঁচার জন্য দেবী অন্নদাকে আশ্রয় করল। দেবীর নাম স্মরণ করলে জীবনে অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না, এমনই বিশ্বাস ছিল মানুষের। তাই শিবও অন্নের জন্য সাধারণ মানুষের মতই দেবী অন্নদার পূজার্চনা করেছেন —

"*একমনে মোর গীত যে করে মান না।*

আমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা।।

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী পাইয়া।

গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া।।

... ...

করতলে তার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম।।

কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল।

গাওয়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল।।

আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়।

সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায়।।

পালা কিম্বা জাগরণ যে করে মান না।

গাইবে যে দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা।।

যেইজন উপাসনা করিবে আমার।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার।।

বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ।

করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ।।

বিদায় হইয়া যত দেব ঋষিগণ।

আপন আপন স্থানে করিলা গমন।।

নিজ নিজ ঘরে সবে মহাকুতূহলে।

করিলা অন্নদাপূজা অষ্টাহ মঙ্গলে।।

অন্নে পূর্ণ হইল ভুবন চতুর্দ্দশ।

... ...

সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের রজনী।

অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী।।

রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।

যে শুনে মঙ্গলা তার করহ মঙ্গল।।"[৬৮]

এভাবেই দেবী অন্নপূর্ণা মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে ''*সমস্ত ভক্তদের কৃপা বিতরণ করে ঐশী শক্তির প্রকাশ ঘটালেন।*''[৬৯] ফলে অন্নদাদেবীর মহিমা সকলের নিকটে উদ্ঘাটিত হতে শুরু হল। ব্যাসদেব, শিব সবাই দেবী অন্নদার ভক্ত। ভক্তস্থল এরূপ বিস্তৃত হলে দেবীকেও তো বিস্তৃত মনে আশীর্বাদ করতে হয়। সমাজে যেরূপ সংশয় ও অস্থিরতার দোলাচল প্রবৃত্তি মানুষের মনকে ব্যাহত করে তুলেছিল সেভাবে পুরাণ প্রণেতা ব্যাসদেবও আহত ও পর্যুদস্ত। কবি ভারতচন্দ্রও এভাবে আহত হয়েছিলেন।

সমাজের চারপাশে ঘটে চলা অরাজকতা, বিপর্যস্ত জীবনের বিবরণ আলোচ্য 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর করে। বলা যায়, ''*ভারতচন্দ্রের পিতার সঙ্গে বর্ধমান রাজপরিবারের সংঘাতের কারণে বালক কবিকে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করতে হয়। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর অগ্রজেরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার মূল্য দেন না। জীবিকার জন্যে তাই ভারতচন্দ্রকে রামচন্দ্র মুনশির কাছে ফারসি ভাষা শিখতে হয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রীতি নয় প্রয়োজনই তখন বড় হয়ে ওঠে। জীবনের এই পর্বে কোন স্থিতি খুঁজে পান নি ভারতচন্দ্র। পাননি আপনজনের স্নেহচ্ছায়া।*''[৭০] মানুষ এভাবেই আপনজন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। অভাবের তাড়নায় শিবও এভাবে পরিবার পরিজন থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন, পরবর্তিতে দেবী অন্নদা তাঁর সংসারের অভাব দূর করলে তিনি দেবীর ভক্ত হয়ে পড়েন। দেবী অন্নদা শিবকে পরিচালনা করছেন, তা জেনে শিবভক্ত ব্যাসদেব দেবী অন্নদার ভক্ত হয়ে পড়েন। মানুষ বুঝতে পেরেছিল, যে দেবতা জীবনে বাঁচাবেন তাঁকেই পূজা করা উচিত। অতিরিক্ত ভাবভক্তি দেখিয়ে লাভ নেই। ''*অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ব শতাব্দীর মতো দেবনির্ভর ধর্মবাদ আর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না — মানুষই নিজের প্রয়োজনে তাঁকে ব্যবহার করেছে।*''[৭১]

ধর্ম, পূজা-পার্বণ এখন মানুষের কাছে প্রয়োজনের বিষয়, প্রয়োজন পড়লেই দেব-দেবীদের স্মরণ করা হয়। ব্যাস দেখলেন শিবভক্ত হয়ে তিনি কোথাও অন্ন পাচ্ছেন না, অন্নদার স্বামী শিব তাঁর মায়ায় অন্ন হরণ করলেন যাতে করে ব্যাস কোন অন্ন না পান। স্বামী হয়ে স্ত্রী অন্নদার জন্য তিনি এরূপ করলেন, কারণ হয়তো তিনি চাইছেন সমাজে তাঁর স্ত্রীর প্রতিষ্ঠা হোক। তাছাড়া স্ত্রীর গুরুত্ব

তিনি তাঁর জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তা না হলে তাঁর ভক্তকে অন্নদার ভক্ত করতে কখনো চাইতেন না —

''ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।

ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন।।

শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।

হাত হৈতে হরিয়া ভৈরব লয়ে যায়।।

রিক্তহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।

মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত।।

এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।

ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি।।

... ...

এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল।

ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল।।

... ...

ঘরে ঘরে ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া।

আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া।।

হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা।

ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা।।''[৭২]

দেবী অন্নদা ব্যতীত আর কেউ অন্ন দিতে পারেন না —

''প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।

অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই।।''[৭৩]

তাছাড়া, শিবও চেয়েছিলেন যে অন্ন দান শুধু দেবী অন্নদাই করবেন। বলা যায় যে, যদি শিব

অন্নদাকে গুরুত্ব না দেন তাহলে শিবকে হয়তো আবার পূর্বের মতন গৃহে গৃহে ভিক্ষা করতে হত। মানুষ আসলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি, প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই দেবদেবীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করে। শিবও তাই করেছেন। শিবভক্ত ব্যাসদেবকেও সেভাবেই দেখা যায়—

''অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে।।
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।''[৭৪]

ব্যাসের প্রয়োজন দেবী অন্নদা পূর্ণ করে দিয়েছেন বলে তিনিও দেবী অন্নদার ভক্ত হয়ে গেলেন। নারীর কর্তব্য পরিবারের সবাইকে পেটপুরে ভোজন করানো। দেবী অন্নদাও তার ব্যতিক্রম নন, জগতের সবাইকে তিনি অন্ন দান করেছেন। পরিবারের সকলকে নিয়ে তাই দেবী ভোজনে মত্ত হয়েছেন —

''গজানন ষড়ানন সঙ্গে করি পঞ্চানন
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্ন দেন হৃষ্টমতি
ভোজন করিছে ভূতগণ।।
ছয় মুখ কার্ত্তিকের গজমুখ গণেশের
মহেশের নিজে মুখ পঞ্চ।
কত মুখ কত জন বেতাল ভৈরবগণ
ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ।।
লেগেছে সিদ্ধির লাগি খেতে বড় অনুরাগী
বার মুখ তিনি বাপে পুতে।
অন্নদার হস্ত দুটি অন্ন দেন গুটি গুটি
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে।।

অন্নদা বুঝিলা মনে কৌতুক আমার সনে

বুঝা যাবে কেবা কত খান।

চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় পাতে পাতে অপ্রমেয়

পয়োনিধি পর্ব্বত প্রমাণ।।

খাইবেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধিহত

অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।

অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি

খেতে হবে খাও খাও খাও।।

এইরূপে অন্নপূর্ণা খেলারসে পরিপূর্ণা

নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে।"[৭৫]

পতি-পুত্র নিয়ে দেবী অন্নদা ভোজনে মেতে উঠেছেন। ঘরকন্যার কাজ সামলানো নারীর প্রধান কর্তব্য। তার মধ্যে রন্ধন হলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রও নারীকে সেভাবেই চালনা করেছে।

দেবী কৃপাপ্রার্থী আরেকটি চরিত্র হল হরিহোড়। কুবেরের অনুচর বসুন্ধর মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে জন্মগ্রহণ করেন হরিহোড় নামে। হরিহোড় যে ঘরে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখী, দারিদ্র্যতা তাঁদের পরিবারকে গ্রাস করে নিচ্ছে। অন্নের অভাবে পরিবারের সকলের অস্থি বেরিয়ে যাচ্ছে। এমনই দুঃখে দিন যাপন করছেন হরিহোড়ের মাতা পদ্মিনী —

"*হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।*

তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়।।

লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।

ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন।।

অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার।

গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার।।

আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি।

... ...

পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী।।

ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।

যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাহারে।।

মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।

কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়।।"[৭৬]

এত কষ্টের সংসারে পদ্মিনী তাঁর স্বামীর সঙ্গে বহু কষ্টে দিন যাপন করছেন। এই দুঃখের সংসারে দেবী অন্নদার দর্শন পেলেন পদ্মিনী। কারণ দুঃখের সংসার না হলে যে দেবীর গুরুত্ব কেউ বুঝে উঠতে পারবে না। তাই দেবী পদ্মিনীকে পুত্রবতী হবার বর দিলেন এবং তাঁর সংসারে কোন দুঃখ থাকবে না বলে একটি ফুল আশীর্বাদ স্বরূপ দান করে বিদায় নিলেন —

"*অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুষিও পূজায়।*

হইবেক নামডাক রাজায় প্রজায়।।

মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে।

বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিয়া তাহাতে।।

কানে কানে কহিলেন যতনে রাখিবে।

ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে।।

এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।

দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান।।

ক্ষণেতে সম্বিত পেয়ে লাগিলা কান্দিতে।

হায়রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে।।

পেয়েছিনু মানিক আঁচলে না বান্ধিনু।

নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু।।

কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিলা।

অভাগীর ভাগ্যদোষে পুন লুকাইলা।।

হরিষ বিষাদে রামা গেল নিজালয়।

দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয়।।

স্নানদিনে সেই ফুল বাটিয়া খাইল।

পতিসঙ্গে রতিসঙ্গে গর্ভিণী হইল।।

শুভক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস।

এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশমাস।।

গর্ভবেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা।

... ...

পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই।"[৭৭]

পুত্রের মুখ দর্শনে সমস্ত বেদনার ইতি হয়ে যায়। কারণ বিবাহের পর পুত্রসুখই সবচেয়ে বড় সুখ। সেই সময়ে পুত্রবতী নারীই সর্বসুখের অধিকারী —

"*অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম লয়ে*

বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।

দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ

পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল।।

ষষ্ঠীপূজা হৈল সায় ছয়মাসে অন্ন খায়

যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।

বনে মাঠে বেড়াইয়া কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া

বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে।।"[৭৮]

নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে হরিহোড় যুবা হয়ে উঠলেন। তিনিও বাবার মতো কুড়িয়ে যা পান তা দিয়েই পরিবারের ভরণ পোষণ করেন। দেবী অন্নদার মায়ায় হরিহোড় একদিন কোথাও ঘুঁটে পাচ্ছিলেন না, চতুর্দিকে তাঁর অন্ধকার মনে হতে লাগল। হরিহোড়ের ঘরে বৃদ্ধপিতা রয়েছেন ঘুঁটে না পেলে তাঁরা যে নিরন্ন থাকবেন। তখন বৃদ্ধা সেজে দেবী অন্নদা হরিহোড়কে যাচাই করতে লাগলেন —

"*বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে*

ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।

কিছু ঘুঁটে না পাইনু মিছা বেলা মজাইনু

এ ছার জীবনে কিবা ফল।।

দয়া করি হরিপ্রিয়া হরিহোড়ে ডাক দিয়া

ছল করি লাগিলা কহিতে।

কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া

অরে বাছা না পারি বহিতে।।

মঙ্গল হইবে তোর অতিদূরে ঘর মোর

ঘুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে।

অর্দ্ধেক আমার হবে অর্দ্ধেক আপনি লবে

দয়া করি চল মোরে লয়ে।।

হরিহোড় এত শুনি অর্দ্ধ লাভ মনে গুণি

মাথায় লইলা ঘুঁটে ঝুড়ি।

বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে লড়ী ধরে থেকে থেকে

আগে আগে চলিলেন বুড়ী।।

নিকটে হরির ঘর নহে অতি দূরতর

সাঁঝ কৈলা সেইখানে যেতে।"[৭৯]

দেবী অন্নদা বৃদ্ধার ছদ্মবেশে হরিহোড়ের গৃহে উপস্থিত হন। ছদ্মবেশী দেবী অন্নদাকে হরিহোড় চিনতে পারেননি, ফলে তিনি তাঁকে ঘরে রাখতে রাজী নন। তাছাড়া পুরুষের মনে সবসময়ই চিন্তা আসে যে তার আর্থিক ক্ষমতা কতটুকু? কারণ বৃদ্ধা যদি থেকে যান তাহলে অতিরিক্ত খাবার তার যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। পরিবারের সকলকেই অন্ন মুখে তুলে দিতে পারবেন না হরিহোড়; তার মধ্যে অতিথির মুখে অন্ন তুলে দেওয়া আরও কঠিন কাজ। তাই হরিহোড় নিজের সংসারের অভাব ও ত্রুটির কথা বৃদ্ধার নিকটে তুলে ধরেন যাতে করে বৃদ্ধা ঘরের অবস্থা এইরূপ দেখে বিদায় নেন—

"তাহার উঠানে গিয়া বসিলেন হরিপ্রিয়া

কহেন চলিতে নারি রেতে।।

কহিলা মধুর স্বরে থাকিলাম তোর ঘরে

হরি বলে এ হবে কেমনে।

ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে

ঠাঁই নাহি হয় চারিজনে।।

অতিথি আপনি হবে উপোসী কেমনে রবে

অন্নের সংযোগ মোর নাই।

হেন ভাগ্য নাহি ধরি অতিথি সেবন করি

এই বেলা দেখ আর ঠাঁই।।

এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ

বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।

গেল চারিপর দিন অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ

যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে।।

হরির শুনিয়া বাণী কহেন হরের রাণী

অরে বাছা না ভাবিহ দুখ।

ভারত সান্ত্বনা করে অন্নদা আইলা ঘরে

ইতঃপর পাবে যত সুখ।।"[৮০]

অতিথি সেবা করা মানে এক অর্থে দেবতারই সেবা করা। হরিহোড় বৃদ্ধা বেশে অন্নদাকে অতিথি রূপেই দেখছেন। বৃদ্ধ মা-বাবা, এমনকি নিজেও অন্নের অভাবে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছেন, তার মধ্যে আবার অতিথি। এখানে প্রাচীন যুগের নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এর একটি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে —

''*টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।*

হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।"[৮১]

'চর্যাপদ'-এ লক্ষণীয় সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের ঘরে অভাব লেগেই আছে; তাদের আর্থিক অবস্থা একেবারেই অনুন্নত। এই অবস্থায় নিজের জন্যই আহারের যোগান দেওয়া অসম্ভব তার উপর অতিথির জন্য অতিরিক্ত আহারের ব্যবস্থা করা সত্যিই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এমন অবস্থাই হয়েছে হরিহোড়ের; কিন্তু দেবী যে ঘরে এসেছেন সেই ঘরে আর কোনও দুঃখ থাকতে পারে না, সেখানে সর্বত্রই সুখের হাওয়া বইবে। দেবী কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছলনার আশ্রয় নেন। আসলে আমরা সকলেই নিজের একটা প্রতিষ্ঠা কায়েম করার জন্য আজীবনই চেষ্টা করে থাকি, দেবতারাও এমনই করেছেন। সকলের কাছে নিজের সমাদর হোক তা আমরা সকলেই চাই। এবারে দেবী অন্নদা নিজের মাহাত্ম্য বুঝাতে গিয়ে হরিহোড়কে বলেন —

''*হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি।*

না জানে গৃহিণীপনা তোমার জননী।।

গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে।

সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে।।

প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয়।

ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয়।।

অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায়।

অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায়।।

শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী।

অন্নপূর্ণা কেবা কি বা কিছুই না জানি।।

বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া।

অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া।।

হাঁড়ী ভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।

কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে।।

শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল।

অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল।।

হাঁড়ী পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি।

দণ্ডবত প্রণাম বুড়ীরে করে আসি।।"[৮২]

গৃহিণীপনা নারীর প্রধান কর্তব্য। গৃহিণীর কাজকর্মেই ঘরে শান্তি বিরাজ করে; কিন্তু পদ্মিনী এমন গৃহিণীপনা জানেন না বলেই তাঁর গৃহে অন্নের অভাব হয়েছে, অর্থাৎ দেবী অন্নপূর্ণাকে ভজনা তিনি করেননি বলেই এই নিরন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দেবী অন্নদা বৃদ্ধা বেশে এমনই বাণী শোনালেন যে দেবী অন্নদার নাম স্মরণ করলে গৃহে কোন অভাব থাকে না, সমস্ত গৃহই অন্নে পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু হরিহোড় বৃদ্ধার পরিচয় না জেনে সেই অন্ন ভক্ষণ করতে চাইছেন না —

"*হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত।*

পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাত।।

ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া।

দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া।।

হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি।

পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি।।

আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্ব্বাহ।

এই ঘুঁটে একখানি বেচিবারে যাহ।।

এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে।

দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে।।

ঘুঁটে হৈল হেমঘুঁটে দেবীর পরশে।

লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে।।"[৮৩]

হরিহোড় যখন দেখলেন যে দেবীর পরশে ঘুঁটে সোনা হয়ে গিয়েছে; তখন তাঁর ভয় হতে লাগল, অভাব মানুষকে এমনভাবেই জর্জরিত করে তুলে যে সুখ-আনন্দের কথা মানুষ ভুলেই যায়। তাই ঘুঁটে সোনা হয়ে গেছে দেখে হরির আনন্দ নয়, ভয় হয়। মনে হয় যেন কোন বিপদের সম্মুখীন তিনি হতে যাচ্ছেন; কল্পনার অতিরিক্ত জীবনে কিছু ঘটলে মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। মানুষের বিশ্বাসের জায়গা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। হরিহোড়েরও এমনই হয়েছিল। তবে দেবী অন্নদা তাঁর ভয় দূর করে তাঁকে বরদান করলেন –

"*অরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়।*

আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয়।।

দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।

ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর।।

চৈত্রমাসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী নিশায়।

করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়।।

আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।"[৮৪]

তাহলে হরিহোড়ের গৃহে সুখ নিশ্চিত হল। দেবী অন্নদার রূপ দেখে হরিহোড় মোহিত। বিশ্বাস না হলেও তিনি যে সত্যি তাঁর গৃহে বর্তমান তা দেখেও যেন হরিহোড় মেনে নিতে পারছেন না। আর অন্নদাও তো এমনিতেই হরিহোড়ের ঘরে আসেন নি, তার কার্যসিদ্ধির জন্যই তো এসেছেন। "*অন্নপূর্ণার পূর্ণতা তার অন্নদারূপে। নিরন্নের মধ্যে অন্নদান-ই অন্নদার একমাত্র ব্রত।*"[৮৫] এই ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যেই হরিহোড়ের গৃহে দেবী অন্নদার আগমণ ঘটেছে। স্বর্গের বসুন্ধর শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে হরিহোড় রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন; দেবীর পূজা প্রচারের জন্য। মর্ত্যে সে কুলীন, তাই তাঁর তিন স্ত্রী। সেই সময়ের সমাজে এভাবেই কুলীনের বহু-স্ত্রী রাখার রীতি ছিল, হরিহোড়ের জীবনেও তাই দেখা যায় –

"*ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।*
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা।।
পিতামাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন।।
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া।"[৮৬]

তবে হরিহোড় পত্নী বসুন্ধরা স্বর্গে স্বামীর অনুপস্থিতিতে পতিশোকে কাঁদতে শুরু করেন। কারণ স্বামী ছাড়া স্ত্রীর কোন আনন্দ-সুখ থাকতে পারে না। তাছাড়া মর্ত্যে তিনি সতীনের সঙ্গে বাস করছেন তা আরও দুঃখজনক। স্বামী যেরকমই হোন, কোন স্ত্রীই তাকে অন্য নারীর সঙ্গে দেখতে পছন্দ করে না। বসুন্ধরারও পছন্দ ছিল না। তাই তিনি দেবীকেই জবাবদিহি করছেন–

"*কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোক রূপে।*
আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া।
স্বামীহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া।

আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।।

... ...

সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়।

শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী।।

ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি।

পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে।।

অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে।

ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।।

তবে কেন স্ত্রী পুরুষ কৈলা রতি সৃষ্টি।"[৮৭]

বসুন্ধরা স্বামীহীনা হয়ে জীবন কাটাতে চান নি, শিব অন্য নারীর কাছে গেলে অন্নপূর্ণার যেভাবে সহ্য হয় না, বসুন্ধরাও স্বামীকে অন্য নারীর সঙ্গে দেখে দুঃখে কাঁদছেন। বসুন্ধরা তাঁর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে পারছেন না বলে অন্নপূর্ণাকে এভাবে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। সেই সুযোগে দেবী অন্নদা বসুন্ধরাকেও মর্ত্যে নিয়ে এলেন —

"*আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত।*

তার বংশে ঝড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত।।

ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।

তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া।।

শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ।

একবোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ।।

মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া।

সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া।।"[৮৮]

সোহাগী নাম নিয়ে বসুন্ধরা এবার হরিহোড়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। কারণ

ভবিতব্য সেটাই ছিলো। ভবিতব্যকে খণ্ডানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয় –

''ভবিতব্যং ভবত্যের খণ্ডিতে কে পারে।

বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈলা তারে।।

শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।

লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী।।

বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।

আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া।।

অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল।

চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল।।

ঝড়ু করে ঠকামি সোহাগী দ্বন্দ্ব করে।

নানা মতে ধন যায় রাজা ছল ধরে।।

কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।

ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর।।

সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে।

যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে।।''[৮৯]

হরিহোড়ের স্ত্রীরা একসঙ্গে কোন্দল বাঁধিয়ে তাঁর জীবনকে যন্ত্রণাময় করে তুলেছে। হরিহোড় বৃদ্ধ বয়সে যুবতী সোহাগীকে বিবাহ করে ঘরে এনেছেন। তাতে কোন্দল আরও গভীরতর হয়ে উঠেছে। দেবী অন্নদার ক্রোধ বাড়ল কারণ যেখানে কোন্দল বেশি হয় সেখানে তিনি থাকতে পারবেন না। তাই তিনি অন্যঘরে যাত্রা করতে প্রস্তুত হলেন। আসলে হরিহোড়ের দ্বারা দেবীর কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে, তাই তিনি অন্যত্র চলে যাবার বাসনা করেছেন –

''গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকালে আন্দুলিয়া গ্রাম।

তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।।

যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম।

রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে।।

এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে।।

তাহে রাম সমদ্দার নাম একজন।

শ্রোত্রিয় কেশরী গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।।

সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী।

ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি।।

রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা।

নলকূবরেরে দেবী সেই গর্ভে দিলা।।

শুভক্ষণে নলকূবরের গর্ভবাস।

এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশমাস।।

ভূমিষ্ঠ হইল নলকূবর স্বচ্ছন্দে।

ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে।।"[৯০]

সীতা ঠাকুরাণীর গর্ভে নলকুবের ভবানন্দ নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। সমাজে প্রচলিত নানান নিয়ম-নীতির মধ্য দিয়েই ভবানন্দ বিবাহ করেন। তাঁর চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নামে দুই স্ত্রী। চন্দ্রমুখীর তিন পুত্র। যুবতী স্ত্রী পদ্মমুখীর সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদারের বিশেষ ভাব। এমন গৃহে দেবী অন্নদার আগমণ হচ্ছে। অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রাকালে সমাজের এমন একটি দিক উঠে এসেছে যে, তা থেকে নরনারীর অন্তর্জীবনের চিত্র আমাদের নিকট আরও স্পষ্ট হয়ে যায় –

''*অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।*

পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে।।

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।

ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।।

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।

একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।।

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।

ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার।।"[৯১]

অন্নপূর্ণা নদী পার হয়ে ভবানন্দ ভবনে যাত্রা করবেন; কিন্তু একজন নারীর পক্ষে নদী পার হওয়া এত সহজ নয়। তাই তিনি খেয়ার জন্য ঈশ্বরী পাটনীর সাহায্য কামনা করলেন। পাটনী পরিচয় না জেনে তাকে নদী পার করে দেবে না। তার মধ্যে সেই সময়ের সমাজে যেখানে নারীদের অন্তঃপুর থেকে বেরোনোই নিষেধ ছিল, সেখানে এভাবে একা একজন নারীকে খেয়াঘাটে দেখে পাটনীর ভয় হয়। তার উপর অন্নপূর্ণা কুলবধূ। কুলবধূ দেবী অন্নপূর্ণা নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে –

''*জানহ স্বামীর নাম নামি ধরে নারী।।*

গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশজাত।

পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশখ্যাত।।

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।

অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।।

অতিবড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।।

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।

কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।

জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।।

ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।

না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।।

অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।

যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।।

পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।

যেখানে কুলীনজাতি সেখানে কন্দল।।"[৯২]

স্ত্রীদের স্বামীর নাম মুখে আনা নিষেধ। তাই দেবী অন্নপূর্ণা স্বামীর নাম উচ্চারণ না করেই তার বংশের পরিচয় দিলেন। কুলীন তাঁর স্বামী, তাই স্বামীর অনেক স্ত্রী বর্তমান রয়েছে, তাঁদের সংসারে কোন্দল-কলহ নিত্য সঙ্গী। সেই সময়ে আসলে প্রতিটি ঘরেই সেই একই চিত্র ছিল। তাছাড়া অন্নপূর্ণা তাঁর জীবনের কথা এমনভাবে তুলে ধরলেন যে পাটনী তা শুনে যেন তাকে খেয়াপার করে দেয় সহজে। তাই পাটনী বলে –

"*শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।*

দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল।।

যার নামে পার করে ভব পারাবার।

ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার।।"[৯৩]

অন্নপূর্ণাকে ঈশ্বরী পাটনী পার করে দেবে ঠিকই, বিনিময়ে সে কিছু নেবে। তাই দেবীকে সে আগেই তার চাওয়ার কথা বলেছে। ঈশ্বরী পাটনী সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। অর্থের বিনিময়ে সে খেয়া পারাপার করে দেয়; যে অর্থ দিয়ে তার সংসারে অন্নের যোগান হয়। তার মধ্যে সামাজিক বিপর্যয়ে, আক্রমণে মানুষ ক্রমশঃ অসহায় হয়ে যাচ্ছিল। এই অসহায়তার মধ্যে দেবী অন্নদাকে দেখে তার মনে হয়েছিল যেন "*সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকিনী কুলকামিনী- গৃহত্যাগিনী কি? কেন? অপকর্মে উদ্ধত বা ভীত পদক্ষেপ তো নয়! দেখলেই কেমন ভাল লাগে, যেন ভক্তি হয়, মা বলতে ইচ্ছা করে, পরের ঘরে চলে যাওয়া নিজের লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো মেয়েটির কথা মনে পড়ে। অব্যক্ত ব্যথায় পাটনীর বুক টনটন ক'রে ওঠে, সে আনমনা হয়ে পড়ে, আহা, না জানি শ্বশুরবাড়িতে সে কেমন আছে! এই মেয়েটি নিশ্চয় যন্ত্রণা সইতে না পেরে গৃহত্যাগ*

করেছে। এর স্বামী কেমন– বৃদ্ধ? নেশাখোর? রোজগারপাতি বোধ হয় করে না। নিশ্চয় অনেকগুলি সতীন, শাশুড়ী-ননদী রাক্ষসীর মতো — পাটনীর কষ্টবোধ হতে থাকে। তার জীবনের এই এক দুঃখ — খেয়াঘাটে কত মর্মান্তিক বেদনার নীরব সাক্ষী হতে হয়।"[৯৪]

অন্নপূর্ণার জীবনের দুঃখের কথা শুনে পাটনীর দেবী অন্নদার প্রতি একটা মানবিক বোধ জেগে উঠল। নারীজীবনের দুঃখজ্বালার পরিচয় অন্নদা দিয়েছেন। কুলীন ঘরে যে অন্তর্কলহ চলতে থাকে তার ভয়াবহ চিত্র এই কাব্যে রয়েছে। দেবীর জন্য পাটনীর চিন্তা হতে লাগল। নৌকায় দেবীকে বসিয়ে পাটনীর মনে হল দেবীর পা নিচে পড়লে হয়তো কুমীর নিয়ে যেতে পারে তাই সে কাঠের সেঁউতি দিল, দেবী তাঁর রাঙা পা-খানি সেখানে রাখলেন —

"পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।।
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে।।
... ...
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।।
সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।।"[৯৫]

সেঁউতী সোনা হয়ে গিয়েছে দেখে পাটনী মনে মনে বুঝতে পারল যে অন্নদা সাধারণ মেয়ে নয়, দেবতাই। সেঁউতী সোনা হয়ে যাওয়া অর্থাৎ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তে সোনার মত দিন মানুষের জন্য অপেক্ষমান। আসলে *"ঈশ্বরী পাটনীর সময়টা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। নবাবী অপশাসনে বাংলাদেশ বিপর্যস্ত এবং প্রজার ধনপ্রাণ বিপন্ন। চারিদিকে অরাজকতা। তার উপর মারাঠা বীর ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্ব বাংলাদেশে বর্গী আক্রমণ ও লুণ্ঠন। এর ফলে বাঙালী হৃতসর্বস্ব ও অন্নহারা আশ্রয়হীনতা ও অন্নহীনতা তৎকালীন বাঙালীর*

দৈনন্দিন জীবনের রোজনামচা। এই আশ্রয়হীন, অন্নহীন বাঙালী প্রতিনিধি হলেন ঈশ্বরী পাটনী।"[৯৬] তাই হয়তো দেবী অন্নদা পাটনীকে দর্শন দিয়েছেন। নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দেওয়াই যে দেবীর প্রধান কাজ। পাটনী ভালই বুঝতে পেরেছে যে দেবী তাকে দয়া করে দেখা দিয়েছেন—

"*আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।*
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।।
কতদিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে।।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব।।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।"[৯৭]

অন্নের অভাবে সেই সময়ে যখন মানুষ জর্জরিত; তখন অন্নের ভাবনা ছাড়া মানুষের আর কোনো ভাবনাই ছিলো না। "*অন্নের জন্য হাহাকার এই শতকে তীব্র হয়ে উঠেছিল। কবির আরাধ্য অন্নপূর্ণা সকলকে অন্ন জোগান। অন্নের সেই সংকটের কালে ঈশ্বরী পাটনী তার আপনজনের জন্য অন্নপূর্ণার কাছে তো অন্নের প্রার্থনাই করতে পারে।*"[৯৮] তাছাড়া, একথা বলা অনুমেয় যে দেবীর কাছে বর হিসাবে ঈশ্বরী পাটনী ধন-সম্পদ, মোক্ষ যা কিছুই ইচ্ছে করলেই পেতে পারত;মানুষকে যেখানে দুর্ভিক্ষ তাড়া করে ফিরে সেখানে এই ইচ্ছা মনে হয় খুবই গৌণ। এই দুঃখ-যন্ত্রণা পাটনী নিজেও সহ্য করছে। "*সেই অত্যাচার ও অন্নহীনতা থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে নিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে রেখে যেতে হলে এই তো সুযোগ — যে সুযোগ হাতছাড়া না করে দেবীর কাছে চেয়ে নিয়েছেন — 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' তাই ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনা তৎকালীন নিরন্ন মানুষের হৃদয়ের বাণী। কারণ একমুঠো অন্নের জন্য যেখানে প্রাণপাত*

পরিশ্রম করতে হয়, সেখানে সে তার উত্তরপুরুষের জন্য দুধেভাতের চিরস্থায়ী সংস্থান করে নিয়েছে।"[৯৯]

যুগ পরিবেশের ক্রিয়াকলাপে একমাত্র সন্তানদের কথা ভেবে অন্নের চাহিদা মনে পোষণ করা খুব স্বাভাবিক। পাটনীও তাই করেছে, সেই সময়ের সমাজে বাঁচার তাগিদেই মানুষ শুধু অন্নের জন্যই বর চাইতে পারে। আসলে ''*যুগসন্ধিক্ষণে যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় অর্থাৎ সার্বিক সংকট দেখা গেছে সেখানে মানুষের বেঁচে থাকাটাই বড়ো সমস্যা। সংকটের বাতাবরণে সবচেয়ে বড়ো সংকট হয়েছে অন্নের সমস্যা। খালি পেটে বেঁচে থাকাই যেখানে দায় সেখানে অন্য সবকিছু প্রয়োজনহীন। ... সেহেতু শুধুমাত্র বাঁচতেই খাদ্যের কথা পাটনীর মুখে এসেছে। ... মানুষ নিজের বেঁচে থাকার অর্থ সন্তানের মধ্যে খুঁজে পায়। বর্তমান সময় কোনোক্রমে অতিক্রান্ত হলেও ভবিষ্যতের স্বাচ্ছন্দ্য সকলেই আশা করে। সেই আশাতেই পাটনী উত্তরপুরুষের বিঘ্নহীন জীবন যুগপ্রেক্ষিতে কামনা করেছে। পাটনী জেনেছে দেবী বিশ্বজননী। সবকিছুই তার করতলগত। তার আশীর্বাদে ধন-দৌলত, বিপুল রাজ্যসম্পদ সবই লাভ করা যেতে পারে অথবা পাওয়া যেতে পারে মোক্ষ-মুক্তি। কিন্তু সে সবই হয়েছে উপেক্ষিত।*"[১০০] অন্ন ছাড়া জীবনে সবকিছুই তুচ্ছ। তাই দেবী অন্নদাও নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য তাদের কাছেই গেছেন যাদের নিকট অন্নের অভাব আছে।

অন্নাভাবে জর্জরিত মানুষ দেবী অন্নদাকে কাছে পেয়ে যেন নিজের জীবনের একান্ত ইচ্ছেগুলি প্রকাশ করেছে। তাই এবার দেবী ভবানন্দের বাড়ি যাত্রা করেছেন —

''*হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা।।*
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে।।
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবত হৈলা ভবানন্দ মজুন্দার।।
অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা কত কব তার।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার।।"[১০১]

দেবী অন্নপূর্ণাকে পুজো করলে মানুষের জীবনে সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায়। তাই ভবানন্দ মজুমদারও দেবীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করে নিজের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

সময়ের আবহমান গতির উপর নির্ভর করেই সাহিত্য রচিত হয়। মঙ্গলকাব্যগুলিও এভাবেই রচিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভয়াবহ পরিস্থিতিকে সাক্ষী করেই রচিত হয়েছে ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। দেবী অন্নদা কেন্দ্রভূমিতে বিচরণ করছেন। সংসারে, জীবনে যেসমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয় তা মানুষের নিজেরই সৃষ্টি — তা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মানুষ দেবতাদের শরণাপন্ন হয়। ''*আমাদের জীবন সমাজের সঙ্গে ঘাতে-সংঘাতে মোচড় খেতে খেতে এগিয়ে চলে অনাগত দিনের দিকে। এখানে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, অধ্যাত্মবাদ সবকিছুই আছে। বাইরেকার বিভিন্ন ঘটনার ধাক্কা এসে লাগে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে।*''[১০২] 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়, নানা ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষরা এগিয়ে চলছে। একমুঠো অন্নের জন্য জীবনে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আলোচ্য কাব্য যে সময়ে রচিত হয়েছিল, সময়টা ছিল অস্থির, অশান্ত সময়। পলাশীর যুদ্ধ, বর্গি আক্রমণ, নবাবীর পতন, অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর, মন্বন্তর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর বিপ্লব বিদ্রোহের ক্রমবর্ধমান প্রকোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমিতে চারিদিকে শুধু অন্নের জন্য হাহাকার দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সংসারে দেবী অন্নপূর্ণাকে পেয়ে মানুষ সুখ-সমৃদ্ধির কামনা করতে লাগল। মানুষ হয়তো অল্প অল্প করে দেবতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে চাইছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং মানবিক সচেতনতা এই কাব্যে অবশ্যই জেগেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের এই দেবনির্ভর স্বরূপ ধর্মকেও অকাতরে পাল্টে দিয়েছে। তাছাড়া শিব-পার্বতীর সংসার জীবন ধারায় অন্নের অভাব যে মানুষকে কিভাবে বিধ্বস্ত করে তুলে, সন্তানদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে না পারায় নারীর মনে যে কিরূপ যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, তা 'অন্নদামঙ্গল' পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সংসারে কোন্দল-কলহ নিত্য সঙ্গী, দাম্পত্য সম্পর্কও আর সহজ সরল থাকতে পারে না। সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিয়মনীতির বেড়াজালে মানুষ আবদ্ধ। তার পরিচয়ও বিশেষভাবে এই

কাব্যে ফুটে উঠেছে। অন্নের অভাব দূর করতে স্বামী শিবও ব্যর্থ, তাই বাধ্য হয়ে পার্বতী অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করলেন সংসারে সুখ ফিরিয়ে আনার জন্য। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কবি সাধারণ গৃহজীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। বাঙালিজীবনের অন্তরের চাহিদার কথা ফুটে উঠেছে ঈশ্বরী পাটনীর মধ্য দিয়ে। সে যুগের দরিদ্র, অর্দ্ধাহারী, শ্রমজীবী মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব একটা বেশি ছিল না, পেটভরে খাবার মতো অন্ন, মাথা রাখার মতো একটা ঠাঁই, সামান্য শরীর আবৃত করার জন্য বস্ত্র পাওয়াটাকেই তারা জীবনের পরম কাম্য বলে মনে করত। তাছাড়া 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নরনারীর অন্তর্জীবনের - দাম্পত্য সম্পর্কের যে বিস্তৃত পরিচয় বিভিন্ন মানবিক পরিকাঠামোয় তুলে ধরা হয়েছে তা বাস্তবিক অর্থেই জীবনসমুদ্রের অন্তর্গহন থেকে সংগ্রহ করে আনা এক একটি মুক্তোর মত আমাদের কাছে আজও অতুলনীয় হয়ে রয়েছে।

উল্লেখসূত্র ঃ

১. মিশ্র ড. অশোক কুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস', (১), সাহিত্যসঙ্গী, কলিকাতা বইমেলা - ২০০৯, পৃঃ ২০৯-২১০

২. তদেব, পৃঃ ২১০

৩. তদেব, পৃঃ ২১০

৪. তদেব, পৃঃ ৩০১

৫. তদেব, পৃঃ ৩০৪

৬. মুখোপাধ্যায় শ্রী নির্মলেন্দু (সম্পাদক), 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল, ১৯৮৬, পৃঃ ১৩ (ভূমিকা)

৭. তদেব, পৃঃ ১৬ (ভূমিকা)

৮. তদেব, পৃঃ ১৭ (ভূমিকা)

৯. তদেব, পৃঃ ১০-১১ (ভূমিকা)

১০. সুর ড. অতুল, 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন', সাহিত্যলোক, কার্ত্তিক ১৪১৫, পৃঃ ২৮৪

১১. প্রাগুক্ত, ‘ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল’, পৃঃ ১৪

১২. তদেব, পৃঃ ১১-১২ (ভূমিকা)

১৩. তদেব, পৃঃ ১৭ (ভূমিকা)

১৪. তদেব, পৃঃ ২২ (ভূমিকা)

১৫. গুপ্ত ক্ষেত্র, ‘বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস’, গ্রন্থনিলয়, ২০১২, পৃঃ ১৮৫-১৮৬

১৬. হালদার গোপাল, ‘বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা’, (প্রথম খণ্ড), অরুণা প্রকাশনী, অগ্রহায়ণ, ১৪১৫, পৃঃ ২০৯

১৭. তদেব, পৃঃ ২০৯

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, ‘বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা’, (প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৯৯, পৃঃ ১৬৭

১৯. তদেব, পৃঃ ১৬৯-১৭০

২০. চট্টোপাধ্যায় ড. বিমলভূষণ, ‘বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন’, অণিমা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ১৯৭৭, পৃঃ ১৮৭

২১. গোস্বামী মদনমোহন (সম্পাদনা), ‘ভারতচন্দ্র’, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১১, পৃঃ ১৪

২২. চৌধুরী শ্রী ভূদেব, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’, (প্রথম পর্যায়), দে’জ পাবলিশিং, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃঃ ৪১৯

২৩. প্রাগুক্ত, ‘ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল’, পৃঃ ২২

২৪. তদেব, পৃঃ ২৩

২৫. পট্টনায়ক ড. পুলকরঞ্জন, ‘নারীচেতনার আলোকে মঙ্গলকাব্যের নারী’, সাহিত্যশ্রী, সেপ্টেম্বর, ২০১০, পৃঃ ১৯৭-১৯৮

২৬. প্রাগুক্ত, ‘ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল’, পৃঃ ২৯-৩০

২৭. তদেব, পৃঃ ৩০

২৮. তদেব, পৃঃ ৩৬

২৯. তদেব, পৃঃ ৪২

৩০. তদেব, পৃঃ ৪৪

৩১. তদেব, পৃঃ ৪৫

৩২. আচার্য্য ড. দেবেশ কুমার, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য', সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা বইমেলা, ২০১০, পৃঃ ৭১

৩৩. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ৫১

৩৪. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য', পৃঃ ১৫৬

৩৫. তদেব, পৃঃ ১৫৭

৩৬. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ৫৮

৩৭. দত্ত জয়িতা (সম্পাদনা), 'নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', রত্নাবলী, আশ্বিন ১৪১৭, পৃঃ ১৬৩

৩৮. তদেব, পৃঃ ১৬৩

৩৯. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ৫৯

৪০. তদেব, পৃঃ ৬২-৬৩

৪১. তদেব, পৃঃ ৬৪

৪২. তদেব, পৃঃ ৬৮

৪৩. তদেব, পৃঃ ৬৮

৪৪. তদেব, পৃঃ ৬৯

৪৫. তদেব, পৃঃ ৭৩-৭৪

৪৬. প্রাগুক্ত, 'নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ২৮-২৯

৪৭. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ৭৪

৪৮. তদেব, পৃঃ ৭৪-৭৫

৪৯. প্রাগুক্ত, 'নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ২৯

৫০. ভট্টাচার্য সুকুমারী, 'বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য', চিরায়ত প্রকাশনী, আষাঢ়, ১৪১৩, পৃঃ ৭৫

৫১. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ৭৫-৭৬

৫২. তদেব, পৃঃ ৭৬

৫৩. বসু শঙ্করীপ্রসাদ, 'কবি ভারতচন্দ্র', দে'জ পাবলিশিং, আশ্বিন, ১৩৮১, পৃঃ ১৪৬

৫৪. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ৭৭

৫৫. তদেব, পৃঃ ৭৮

৫৬. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য', পৃঃ ১৬৩

৫৭. তদেব, পৃঃ ১৬২

৫৮. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ৮২-৮৩

৫৯. তদেব, পৃঃ ৮৪-৮৫

৬০. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য', পৃঃ ১৬৪

৬১. তদেব, পৃঃ ১৬৪

৬২. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ৮৫

৬৩. তদেব, পৃঃ ৯১

৬৪. তদেব, পৃঃ ৯৩

৬৫. তদেব, পৃঃ ৯৬

৬৬. তদেব, পৃঃ ৬৭

৬৭. তদেব, পৃঃ ১০৬-১০৭

৬৮. তদেব, পৃঃ ১১০-১১১

৬৯. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য', পৃঃ ১৬৮

৭০. প্রাগুক্ত, ‘নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল’, পৃঃ ১৬৭

৭১. তদেব, পৃঃ ১৬৯

৭২. প্রাগুক্ত, ‘ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল’, পৃঃ ১২৬-১২৭

৭৩. তদেব, পৃঃ ১৩১

৭৪. তদেব, পৃঃ ১৩৪

৭৫. তদেব, পৃঃ ১৫১-১৫২

৭৬. তদেব, পৃঃ ১৬৬

৭৭. তদেব, পৃঃ ১৬৭-১৬৮

৭৮. তদেব, পৃঃ ১৬৮

৭৯. তদেব, পৃঃ ১৬৯-১৭০

৮০. তদেব, পৃঃ ১৭০

৮১. দাশ ড. নির্মল, ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’, দে’জ পাবলিশিং, নভেম্বর, ২০১০, পৃঃ ১৯০

৮২. প্রাগুক্ত, ‘ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল’, পৃঃ ১৭১

৮৩. তদেব, পৃঃ ১৭২

৮৪. তদেব, পৃঃ ১৭৩

৮৫. প্রাগুক্ত, ‘ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য’, পৃঃ ৬৬

৮৬. প্রাগুক্ত, ‘ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল’, পৃঃ ১৭৫

৮৭. তদেব, পৃঃ ১৭৬

৮৮. তদেব, পৃঃ ১৭৭

৮৯. তদেব, পৃঃ ১৭৭

৯০. তদেব, পৃঃ ১৮৪

৯১. তদেব, পৃঃ ১৮৬-১৮৭

৯২. তদেব, পৃঃ ১৮৭-১৮৮

৯৩. তদেব, পৃঃ ১৮৮

৯৪. প্রাগুক্ত, 'কবি ভারতচন্দ্র', পৃঃ ২০৭

৯৫. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ১৮৯

৯৬. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য', পৃঃ ৬২

৯৭. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ১৯০

৯৮. প্রাগুক্ত, 'নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ১৮০

৯৯. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবি ও কাব্য', পৃঃ ৬২

১০০. মজুমদার ভবেশ, 'ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, জন্মাষ্টমী, ২০১১, পৃঃ ৮১

১০১. প্রাগুক্ত, 'ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল', পৃঃ ১৯০

১০২. প্রাগুক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন', পৃঃ ১৯৪